দেশ কাল মানুষের আজ কাল পরশু

নাগরিক

দ্বিতীয় বর্ষ ❖ ৮ম সংখ্যা ❖ ২ সেপ্টেম্বর ২০২৫

➲এই সংখ্যায় থাকছে

- এলোমেলো কথা : বাঙালির পরিচিতি বোধ ২
- শ্রদ্ধাঞ্জলি : রজনীকান্ত সেনকে আমরা কতটা জানি ৩
- বাংলা ভাষা ও বাঙালির পরিচয় নিয়ে বিভেদ ও বিভ্রান্তি ৪
- 'বাংলা'কে ভাষার তালিকা থেকে বাদ দেওয়া বিজেপির এক কৌশলী পদক্ষেপ ৭
- ট্রাম্পের শুল্কবৃদ্ধির অভিঘাত ভারতীয় শিল্প বাণিজ্যে এসে পড়তে শুরু করেছে ৮
- বিহারের নির্বাচনে যাদের নাম বাদ গিয়েছে তাঁরা আধার কার্ড দেখিয়ে ভোটার লিস্ট এ নাম তোলার আবেদন করতে পারবেন ১০
- বেসামাল বিজেপি ও ভোটার অধিকার যাত্রা ১১
- গোলাম মণ্ডলের দুই শিশু সন্তান এখন কোথায় যাবে? ১১
- পরিবেশ ইভি কি 'পরিবেশ পদচিহ্ন' কমাতে পারবে? ১২
- স্বাধীনতা সংগ্রামে রাষ্ট্রীয় স্বয়ং সেবক সঙ্ঘের ভূমিকা ১৫
- জরুরি অবস্থার প্রেক্ষাপট ও সাম্প্রদায়িক দক্ষিণপন্থী প্রতিক্রিয়ার শক্তির অবস্থান ১৭
- বাংলাদেশ 'মঞ্চ ৭১' কে অঙ্কুরেই খতম করার প্রচেষ্টা ইউনুস সরকারের ১৮
- আমাদের স্বাধীনতা এমনি এমনি এসেছে? ১৯
- ১৯৭৫ এ বাংলাদেশে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবের হত্যাকান্ড : খন্দকার মোশতাক ও সি.আই.এ ' র ভূমিকা ২০
- স্মরণ - আনন্দ ঘোষ হাজরা ২২
- আসাম খবরের নীচে চাপা পড়ে যাচ্ছে আসল খবর ২৩
- দেশের গণতন্ত্র হত্যার উদ্দেশ্যে বিজেপি সরকারের নয়া বিল ২৪

➲সম্পাদকীয়

স্বাধীনতার মহান আদর্শ ঊর্ধ্বে স্থাপন করতে হবে

স্বাধীনতা দিবস হচ্ছে সেই দিন, যেদিন আমরা স্মরণ করি ও শ্রদ্ধা জানাই সেই শত সহস্র শহীদদের যাঁদের আত্মত্যাগে আমাদের মাতৃভূমি স্বাধীনতা অর্জন করেছে। ধর্ম, বর্ণ , গোষ্ঠী, লিঙ্গ নির্বিশেষে দেশের কোটি কোটি মানুষ স্বাধীনতা সংগ্রামে যোগ দিয়েছেন ও দেশকে স্বাধীন করেছেন । কিন্তু প্রতিবারের মতন এই বছরও প্রধানমন্ত্রী মোদী তাঁর ভাষণে স্বাধীনতার জন্য এই মহান আত্মত্যাগের কথা একবারও উল্লেখ করলেন না। পরিবর্তে প্রতি বছরের মতো এবারও তিনি তাঁর প্রিয় বিষয় দেশভাগের কথা উল্লেখ করেন ও লালকেল্লার দুর্গ প্রাকার থেকে রাষ্ট্রীয় স্বয়ং সেবক সঙ্ঘের শতবর্ষের কথা উল্লেখ করে তাদের উচ্চ প্রশস্তি করেন। উল্লেখ্য যে RSS কখনও স্বাধীনতা সংগ্রামে যোগ দেয়নি।

স্বাধীনতার পর বিজ্ঞান, প্রযুক্তি ও প্রতিরক্ষার ক্ষেত্রে দেশের যে অগ্রগতি হয়েছে সে কথাও মোদীজি বলেননি যা ভারতের ইতিহাসের প্রতি আদৌ সুবিচারের পরিচায়ক নয়। মহাকাশ গবেষণা (ISRO), পরমাণু গবেষণা (BARC), টেলি যোগাযোগের ক্ষেত্রে দেশের যে অগ্রগতি সাধিত হয়েছে তা সকলের মিলিত প্রচেষ্টার ফল। জাতীয় দিবস এই অগ্রগতির ধারাবাহিকতার উল্লেখ আশা করে। কোনও স্বনির্বাচিত কাহিনি জাতি প্রত্যাশা করেনা। কিন্তু একথা অনস্বীকার্য যে পণ্ডিত নেহরু অসংখ্য বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির প্রতিষ্ঠান স্থাপন করে দেশের বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির অগ্রগতির সূচনা করেন। ইন্দিরা গান্ধির সময় মহাকাশ বিজ্ঞান ও পরমাণু বিজ্ঞানের গবেষণা গতি লাভ করে। রাজীব গান্ধির সক্রিয় তত্ত্বাবধানে তথ্য প্রযুক্তির ক্ষেত্রে বিপুল অগ্রগতি সুচিত হয়। এই অগ্রগতি গুলি আমাদের উন্নয়নের মাইল ফলক যা কখনও মুছে ফেলা যাবেনা। একই সঙ্গে স্বীকার করতে হবে ড. মনমোহন সিংহ-র সময় অর্থনৈতিক অগ্রগতির ক্ষেত্রে যে পরিবর্তন সুচিত হয় তাও বিস্মৃত হলে চলবে না।

নরেন্দ্র মোদী তাঁর বক্তৃতায় অবৈধ অনুপ্রবেশের ফলে এই দেশে চাকরি , জমি ও মহিলাদের ওপর চাপ বৃদ্ধি পাচ্ছে বলে যে উল্লেখ করেছেন তা অত্যন্ত বিরক্তিকর। স্বাধীনতা দিবস কে 'অনুপ্রবেশ' জাতীয় বাগারমবরের সঙ্গে যুক্ত করা সামাজিক বৈষম্য সৃষ্টি করে । নেতৃত্বের কাজ সমাজে উত্তেজনা প্রশমিত করা , তা বৃদ্ধি করা নয়। সাম্প্রদায়িক ঐক্য গড়ে না উঠলে কখনো জাতীয় সংহতি প্রতিষ্ঠিত হতে পারে না। ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রাম অন্তর্ভুক্তিমূলক , অসাধারণ নেতৃত্ব ও রাজনৈতিক লাইনের ওপর ভিত্তি করে যা গড়ে উঠেছে। স্বাধীনতা দিবসের দিন নিজ নিজ তাত্ত্বিক আনুগত্য সরিয়ে রেখে স্বাধীনতা আন্দোলনের ঐতিহ্যকে সম্মান করা উচিত। অতীতের সাফল্যকে স্বীকার করা ভবিষ্যৎ গড়ে তোলার জন্যই প্রয়োজন। সরকার পরিবর্তন হতে পারে, কিন্তু রাজনৈতিক সুবিধার জন্য ইতিহাস পুনরায় লেখার চেষ্টা বর্জনীয় ।

সম্পাদক

শান্তনু দত্ত চৌধুরী

সৌর বসু কর্তৃক সীমান্ত পল্লী, শান্তিনিকেতন, বীরভূম, পিন ৭৩১২৩৫ থেকে প্রকাশিত।

ই মেইল : nagorik0240@gmail.com ●ফোন : 80178 04019 / 94340 22512 ● ওয়েবসাইট : nagorik.co.in

এলোমেলো কথা

বাঙালির পরিচিতি বোধ

শুভ বসু

অষ্টাদশ শতকে বাংলায় এক দিকে যেরকম মুসলমানি পুঁথি চর্চার ধারণা ছিল সেই রকম ছিল মঙ্গল কাব্যর ধারণা। মঙ্গল কাব্যের ধারায় কুমকুম চট্টোপাধ্যায় তাঁর গ্রন্থ The Cultures of History of Early Modern India Persianization and Mughal Cultures in Bengal দেখিয়েছেন কি ভাবে মুঘল তারিখ রচনা এবং ফার্সি সংস্কৃতি বাংলার উপর প্রভাব ফেলে। মুঘলরা হয়ে ওঠে পরিচিত অসুর । বাঙালি ব্রাহ্মণ এবং কায়স্থ মুঘল এবং পরে পারস্য থেকে আসা শিয়া নবাব নাজিমদের তৈরী করা অভিজাত দের অংশ বিশেষ। উদাহরণ স্বরূপ বলা যায় যে সিরাজের সামরিক দেওয়ান ছিলেন রাজা রায় দুর্লভরাম। সিরাজ কলকাতা জয়ের পর বজবজ দুর্গে ইংরেজদের আটকানোর ভার দিয়েছিলেন রাজা মানিকচাঁদের উপরে। কর্নেল ক্লাইভ যখন চন্দননগরে ফরাসিদের আক্রমণ করেন তখন হুগলির ফৌজদার ছিলেন মহারাজ নন্দ কুমার। তিনি অবশ্য ইংরেজদের কাছে থেকে আগেই উৎকোচ গ্রহণ করে যুদ্ধ যখন শেষ তখন কিছু সেনা নিয়ে চন্দননগর ঘুরে এসে বললেন 'সব শেষ জাহাপনা আমার কিছু করার ছিল না।' এই সব ফার্সি নবাবদের বাংলায় বাংলা ভাষী মুসলমান প্রজা রয়েছে এই ধারণা ছিল না।

আসলে মুর্শিদ কুলিখাঁর সময় থেকে জমির ইজারা বিলি করা হয় বাংলায় উচ্চ বর্ণের হিন্দুদের মধ্যে। তাঁরা প্রজাদের থেকে খাজনা আদায় করে নবাব মুর্শিদ কুলি খাঁর কাছে পাঠাতেন। নবাব নাজিম সেই খাজনা বাদশাহ ঔরঙ্গজেব কে পাঠাতেন। ফলে লর্ড কর্নওয়ালিস নন মুর্শিদ কুলি খাঁর দৌলতেই বঙ্গে হিন্দু জমিদারদের রমরমা। এঁদের মধ্যে মূল ছিলেন বর্ধমানের রাজা , বিষ্ণুপুরের রাজা, নদিয়ার রাজা, দিঘাপতিয়া র রাজা, রাজশাহীর রাজা আর নাটোরের রাজা। ঢাকার রাজবল্লভ সেন কম ছিলেন না। এই দেশীয় জমিদারদের দরবার মধ্যে থেকে ফার্সি মিশ্রিত বাংলায় সাহিত্য রচিত হয়েছে। আমার বক্তব্য খুব পরিষ্কার, মুর্শিদাবাদের নবাব দরবারের কোনো ধারণা ছিল না। মঙ্গল কাব্য পুঁথি সাহিত্য এবং বৈষ্ণব পদাবলী রামায়ন মহাভারত এমং কি পশ্চিমবাংলার মুসলমানদের মধ্যে প্রচলিত দোভাষী পুঁথি ছিল বাঙালিদের সাহিত্য। তার কিছুটা দেশি জমিদারদের পৃষ্ঠপোষকতায় তৈরী।

অষ্টাদশ শতকে ইংরেজদের ক্ষমতা আরোহনের পর থেকে বাংলার সংস্কৃতিতে রূপান্তর শুরু হয়। প্রথমত ইংরেজদের ধারণা ছিল ফার্সি মুসলমানদের ভাষা এবং বাংলা হিন্দুদের ভাষা। তার উপরে ফরাসি বিপ্লবের পরে নেপোলিয়নের সঙ্গে যুদ্ধর সময়ে যখন ইউরোপে ইংরেজদের পরিত্রাহি অবস্থা তখন ভারতে সাম্রাজ্য বিস্তার ছিল তাঁদের কাছে বাঁচার উপায়। সেই সময় থেকে ইউরোপে মুদ্রণ পুঁজির বিকাশের ফলে দেশে শুরু হয় ছাপা খানা। পঞ্চানন কর্মকার শুরু করেন তাঁর বাংলা মুদ্রণের ঢালাই। সেই থেকে শুরু হয় একটি প্রমিত বাংলা গদ্যের অনুসন্ধান। কলকাতায় রামমোহন এর মতো নতুন বুদ্ধিজীবীরা শুরু করেন সংবাদপত্রের প্রচলন। নব্য প্রতিষ্ঠিত ফোর্ট উইলিয়াম কলেজএ শেখানো হয় ইংরেজদের দেশীয় ভাষা। ইংরেজরা যেহেতু বাংলায় প্রকৃত নেতার সন্ধান করছিলেন এবং বাংলাকে হিন্দু দের ভাষা বলে ভাবতেন সে হেতু মৃত্যুঞ্জয় তর্কালঙ্কার , রাম রাম বসু প্রভৃতি বামুন কায়েতদের বাংলা গদ্য বই লেখায় নিযুক্ত করেন। বাংলার অন্য যে সাহিত্যের ধারা মুসলমানি পুঁথি তা বেঁচে থাকে কিন্তু প্রমিত বাংলার সঙ্গে তার সংযোগ থাকে না। তার উপরে ঊনবিংশ শতাধীতে শুরু হয় নতুন মধ্যে বিত্তর উত্থান মূলত কলকাতা কেন্দ্রিক বাঙালি হিন্দু সমাজের মধ্যে থেকে। তাঁদের অনেকে ইংরেজদের লেখা ইতিহাস পড়ে, টড , জেমস মিল, এলিয়ট এবং ডশনের লেখা পড়ে একেবারে আদি আধুনিক যুগের মুসলমানি আমলের যে পাঁচমিশেলি শাসন ছিল এবং নবাবের আমলে যে বাংলায় বামুন কায়েতদের উত্থ্যান সেটা ভুলে মেরে দিলেন। কালী প্রসন্ন সিনহার অসাধারণ ফার্সি বহুল বাংলায় লেখা হুতুমপাঁচার নকশাতে ১৮৫৭ মহাবিদ্রোহের বর্ণনাতে মুঘল সম্রাটকে 'নেড়ে চিফ' বলে বর্ণনা করা হয়েছে। প্যারীচাঁদ মিত্রর আলালের ঘরে দুলাল বলে রচনাতে মৌলবী সাহেবের দাড়িতে আগুন ধরে যাওয়ার একটি কোতুকর বর্ণনা রয়েছে। ঊনবিংশ শতাধীর জীবন জিজ্ঞাসা যে রকম সাহিত্য সৃষ্টিতে নবজীবন এনে দিয়েছিলো সেই রকম বাঙালি মুসলমান কে করেছিল ব্রাত্য।

ঊনবিংশ শতবাদীর বিরল প্রতিভা বঙ্কিমচন্দ্র কিন্তু বাঙালি জাতীয়তাবাদের কথা বলতে শুরু করেন। এক সময়ে ১৮৫৯ সালের প্রজাস্বত্ত্ব আইন সংক্রের পূর্বে তিনি কৃষকের অধিকার নিয়ে কথা বলেন। কিন্তু তিনি সরকারি কর্মচারি হিসাবে এবং এক বহু দ্রষ্টা বুদ্ধিজীবী হিসাবে জানতেন যা বাঙালিদের অর্ধেকে বা তার বেশি হলেন মুসলমান ধর্মাবলম্বী। ইংরেজরা ১৮৭২ সালে লোক গণনা করে ভিরমি খান বাঙালিদের মধ্যে মুসলমান দের আধিক্য দেখে। ১৮৭২ র লোক গণনার পর বাংলায় জাতীয়তাবাদ ধীরে ধীরে প্রবাহিত হয় ভারতীয় জাতীয়তাবাদের ধারায় আর ভারতবর্ষীয় মেলা হয়ে ওঠে হিন্দু মেলা। কলকাতার ঊনবিংশ শতাব্দীর জীবন জিজ্ঞাসা কে ১৯২০ সাল নাগাদ রেনেসাঁস বলা হয়। তবে তারমধ্যে যে হিন্দু জাতীয়তাবাদের বীজ সুপ্ত ছিল সে কথা অস্বীকার করা যায় ন। কিন্তু এর মধ্যে কি কোনো প্রতিবাদী কণ্ঠস্বর ছিল না। ছিলেন যিনি বর্তমানের বাংলাদেশের বুদ্ধিজীবীদের ক্রমাগত আক্রমণের লক্ষ্য , তিনি হলেন যুবক রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, বাংলা সাহিত্যের এক বিরল প্রতিভা। রবীন্দ্রনাথ হিন্দু মেলার সঙ্গে যুক্ত ছিলেন এবং শিবাজী উৎসবের সঙ্গে যুক্ত ছিলেন কিন্তু তিনি ধীরে ধীরে তাঁর লেখাতে মানব

বন্ধনের কথা বলেন। ১৮৯২ সালে রবীন্দনাথ কাবুলিওয়ালা রচনা করেন। যা তাঁর এক অসাধারণ ছোট গল্প। মানব বন্ধনের মধ্যে দিয়ে শ্রেণী, ধর্ম এবং ভাষার পার্থক্য অতিক্রম করে আফগান মেয়ের বাবা আর বাঙালি মেয়ের বাবার মধ্যে হৃদয়ের সম্পর্কের গল্প। হিন্দু সমাজের আর্য্য সভ্যতা নিয়ে বাড়াবাড়িতে তিতিবিরক্ত রবীন্দ্রনাথ ১৮৯৫ সালে লিখেছিলেন-

আমাদের একটা মস্ত কাজ আছে হিন্দু মুসলমানে সখ্যবন্ধন দৃঢ় করা। অন্য- দেশের কথা জানি না কিন্তু বাংলাদেশে যে হিন্দু-মুসলমানের মধ্যে সৌহার্দ্য ছিল সে বিষয়ে সন্দেহ নাই। বাংলায় হিন্দু অপেক্ষা মুসলমানের সংখ্যা বেশি এবং হিন্দু মুসলমান প্রতিবেশী সম্বন্ধ খুব ঘনিষ্ট। কিন্তু আজকাল সেই সম্বন্ধ শিথিল হইতে আরম্ভ করিয়াছে। একজন সম্ভ্রান্ত বাঙালি মুসলমান বলিতেছিলেন বাল্যকালে তাঁহারা তাঁহাদের প্রতিবেশী ব্রাহ্মণ পরিবারের নিতান্ত আত্মীয়ভাবে মেশামেশি করিতেন। তাহাদের মা মাসীগণ ঠাকুরানিদের কোলে পিঠে মানুষ হইয়াছেন। কিন্তু আজকাল শিক্ষিত সম্প্রদায়ের মধ্যে নুতন হিন্দুয়ানী অকস্মাৎ নারদের ঢেঁকি অবলম্বন করিয়া অবতীর্ণ হইয়াছে। তাঁহারা নব্যপার্জিত আর্য্য অভিমান কে শজারুর শলাকার মতো আপনার চারি দিকে কণ্টকিত করিয়া রাখিয়াছেন কাহারো কাছে ঘেঁসিবার জো নাই। হঠাৎ বাবুর বাবুয়ানার মতো তাঁহাদের হিন্দুয়ানী অত্যন্ত অস্বাভাবিক উগ্রভাবে প্রকাশ হইয়া পড়িয়াছে। উপন্যাসে , নাটকে কাগজ পত্রে অকারণে বির্ধমীদের প্রতি কটাক্ষপাত করা হইয়া থাকে। আজকাল অনেক মুসলমানও বাংলা শিখিতেছেন এবং বাংলা লিখিতেছেন - সুতরাং স্বভাবতই এক পক্ষ থেকে ইট এবং অপর পক্ষ হতে পাটকেল বর্ষণ আরম্ভ হইয়াছে। কোথায় তুর্কির সুলতান তিনশো পাচক রাখিয়াছেন ইহা লইয়াই ম্লেছদিগকে তিরস্কার ও হিন্দুয়ানির বড়াই করিয়া আপন পাড়ার প্রতিবেশীদের সহিত বিরোধের সূত্রপাত করিলে তাহাতে হিন্দুদের মাহাত্ম্য নহে , পরন্তু ক্ষুদ্রতার পরিচয় দেওয়া হয়। যদি আমাদের ধর্মের এমন কোনো গুণ থাকে যাহাতে পুরাতন পাড়ার লোককেও আপন করিয়া লইতে বাঁধা দেয় তবে সে ধর্মর জন্য অহংকার করিবার কারণ দেখি না।

(সাধনা পত্রিকা চৈত্র সংখ্যা ১৩০১ (১৮৯৫)

বাংলায় আধুনিক বাঙালির পরিচিতিবোধের ক্ষেত্রে সব থেকে উজ্জ্বল ব্যক্তিত্ব হলেন রবীন্দ্রনাথ। তাঁর লেখা পরেই আমার নিজের মধ্যে সাম্প্রদায়িকতা বিরোধী চিন্তার জন্ম যদিও অনেকে হয়তো ভাবেন আমার লেখা হিন্দু সাম্প্রদায়িকতাতে আচ্ছন্ন । উনিশ শতকের শেষ দিক থেকে বাঙালি মুসলমান মধ্যবিত্তর বাংলা সাহিত্য চিন্তার সঙ্গে বাঙালি হিন্দুর সংস্কৃতির সংঘাত এবং তার ফলে বাঙালির জাতীয় পরিচিতির উপর প্রভাব পড়ে তার বর্ণনা করব।

শ্রদ্ধাঞ্জলি

রজনীকান্ত সেনকে আমরা কতটা জানি

কাজী আলিম-উজ-জামান

একটা রাখাল দুটো গরু নিয়ে যাচ্ছিল। একটা খুব মোটা, আর একটা খুব রোগা। একজন উকিল সেই পথ দিয়ে যাচ্ছিলেন। তিনি রাখালকে জিজ্ঞাসা করলেন 'তোর ও গরুটা অত মোটা কেন, আর এটা এত হালকা কেন? এটাকে খেতে দিস না?' রাখাল উকিলকে চিনত। বলল, 'আজ্ঞে না। মোটাটা উকিল, আর রোগাটা মক্কেল। রাগ করবেন না।'

কৌতুকটির স্রষ্টা রজনীকান্ত সেন। কলকাতা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালের শয্যায় তিনি। গলার এক ধরনের কর্কট রোগে আক্রান্ত। বইয়ের স্বত্ব বিক্রির টাকায় চলছে চিকিৎসা। অস্ত্রোপচারও হয়েছে। ইংরেজ ডাক্তার স্বজনদের তবু বলে দিয়েছেন, আয়ু আছে আর মোটে কয়টা দিন। রজনীকান্তরও সেই কথা অজানা ছিল না। কথা বলতে পারতেন না। ভরসা তাই কাগজ-কলম। মনের কথা সব লিখে রাখতেন। সেই বৈরী সময়েই ডায়েরিতে লিখেছিলেন এ রকম চটুল কথা।

আসলে মানুষটাই ছিলেন এ রকম। বাবা ও কাকার পেশা ছিল ওকালতি। নিজেও সে পথে গিয়েছিলেন। মক্কেলও জুটেছিল বেশ। কিন্তু গান-কবিতার নেশায় মামলার পেছনে সময় দিতে পারতেন না। দিনে দিনে মক্কেলরা অন্য উকিলের ঠিকানা খুঁজে নিলেন। বন্ধু শরৎ কুমার রায়, যিনি ছিলেন প্রথম দিকের বরেন্দ্র অঞ্চল গবেষক, তাঁকে এক চিঠিতে লেখেন, 'আমি আইন ব্যবসায়ী, কিন্তু আমি ব্যবসায় করিতে পারি নাই। কোনো দুর্লঙ্ঘ্য অদৃষ্ট আমাকে ঐ ব্যবসায়ের সহিত বাঁধিয়া দিয়াছিল, কিন্তু আমার চিত্ত উহাতে প্রবেশ লাভ করিতে পারে নাই। আমি শিশুকাল হইতে সাহিত্য ভালোবাসিতাম; কবিতাকে পূজা করিতাম; কল্পনার আরাধনা করিতাম; আমার চিত্ত তাই লইয়া জীবিত ছিল।'

১৩ সেপ্টেম্বর বাংলা গানের অমর গীতিকার ও কবি রজনীকান্ত সেনের প্রয়াণবার্ষিকী। ১৯১০ সালের ১৩ সেপ্টেম্বর তিনি প্রয়াত হন। বাংলাদেশেরই মানুষ তিনি, জন্মেছিলেন পাবনা জেলায়। ওকালতি করেছেন রাজশাহীতে। মাত্র ৪৫ বছরের জীবনের বেশিরভাগ সময় এ অঞ্চলেই কাটিয়েছেন। জন্ম ১৮৬৫ সালে, অর্থাৎ রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের চেয়ে বছর চারেকের ছোট ছিলেন তিনি। তবে চিন্তায় ছিলেন রবীন্দ্রবলয়ের বাইরে।

গান ব্যাপারটা রজনীকান্তের ভেতরেই ছিল। তাঁর মা-বাবা, দুজনই ছিলেন গানের মানুষ। কিন্তু এই রজনীকান্ত সেন সম্পর্কে আমরা কতটা জানি? এই প্রজন্মই-বা কতটা জানে? বাংলা ভাষার যেসব কবি কবিতা রচনার পাশাপাশি সংগীত রচনায়ও বিশেষ

পারদর্শিতা দেখিয়েছেন, তাঁদের একজন রজনীকান্ত সেন। 'পঞ্চকবির গান' বলে একটা টার্ম চালু আছে। অন্য চারজন হলেন রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, কাজী নজরুল ইসলাম, দ্বিজেন্দ্রলাল রায় ও অতুলপ্রসাদ সেন। এর মধ্যে রবীন্দ্রনাথকে নিয়ে চর্চা বেশি, এরপর নজরুল। তাঁদের গানের সংখ্যাও বেশি। তারপর রয়েছেন দ্বিজেন্দ্রলাল ও অতুলপ্রসাদ।

সবচেয়ে কম চর্চা বোধ করি রজনীকান্তকে নিয়ে। 'ধনধান্য পুষ্প ভরা আমাদের এই বসুন্ধরা' এই গান দিয়ে যদি আমরা দ্বিজেন্দ্রলালকে চিনি, 'মোদের গরব মোদের আশা/ আ-মরি বাংলা ভাষা' যদি হয় অতুলপ্রসাদের পরিচয়, তাহলে 'মায়ের দেওয়া মোটা কাপড় মাথায় তুলে নে রে ভাই; দীন দুখিনি মা যে তোদের তার বেশি আর সাধ্য নাই', এই একটি রচনাই কান্তকবির অমরত্বের জন্য যথেষ্ট।

রজনীকান্তের নিজের লেখা ডায়েরি ও মেয়ে শান্তিদেবীর লেখায় তিনি মোটামুটি উঠে এসেছেন। কিছু গবেষণামূলক বইও রয়েছে, যেমন দেবাশীষ ভৌমিকের লেখা 'রজনীকান্ত সেন', সুধীর চক্রবর্তীর 'দ্বিধাহীন অনুভূতির চারণ রজনীকান্ত সেন', গৌরী ভট্টাচার্যের 'রজনীকান্ত সেন ও তাঁর গান', আসাদ চৌধুরীর 'রজনীকান্ত সেন', মোহাম্মদ জুলফিকারের 'সাধক-কবি রজনীকান্ত সেন'। এর মধ্যে কিছু বই দুষ্প্রাপ্য হয়ে গেছে। এসব বই ও পত্রপত্রিকার বিভিন্ন লেখা থেকে তাঁর জীবনের স্বরলিপি কিছুটা বোঝা যায়।

রবীন্দ্র-নজরুলের বাইরে অন্য তিন কবির মধ্যে দ্বিজেন্দ্রলাল রায়ের গানের সংখ্যা ৫০০। অতুলপ্রসাদ লিখেছেন ২০০-র বেশি গান। অপর দিকে রজনীকান্তের গানের সংখ্যা ২৯০। বিভিন্ন লেখাপত্র থেকে জানা যায়, রজনীকান্ত গান লিখে উদাসীনভাবে ফেলে রাখতেন। কিন্তু গাওয়ার সময় আর সেগুলো খুঁজে পেতেন না। স্ত্রী হিরণ্ময়ী দেবী সেগুলো কুড়িয়ে এনে যথাসম্ভব সংরক্ষণের চেষ্টা করতেন।

ঝড়ের বেগে গান রচনা করতে পারতেন রজনীকান্ত। বলা হয়ে থাকে, তাঁর বেশির ভাগ রচনাই অতি অল্প সময়ে রচিত। সাংবাদিক ও লেখক জলধর সেন জানাচ্ছেন এ রকমই একটি ঘটনা। একবার রাজশাহী গ্রন্থাগারে একটি সভার আয়োজন করা হয়। বিকেল চারটায় সভা শুরু হবে। তখন বাজে তিনটা। হঠাৎ রজনীকান্তকে অনুরোধ করা হলো একটি গান লিখতে। বন্ধু অক্ষয়কুমার মৈত্রেয়ই অনুরোধটা করেছিলেন। তিনি তৎক্ষণাৎ এক কোনায় গিয়ে লিখে ফেললেন কয়েকটি চরণ; 'তব, চরণ নিম্নে, উৎসবময়ী শ্যাম-ধরনী সরসা, ঊর্ধ্বে চাহ অগণিত-মনি-রঞ্জিত নভো-নীলাঞ্চলা, সৌম্য-মধুর-দিব্যাঙ্গনা শান্ত-কুশল-দরশা।' পরে যেটি হয়ে ওঠে অসাধারণ একটি দেশাত্মবোধক গান।

'মায়ের দেওয়া মোটা কাপড়' লেখার ইতিহাসও তাই। ১৯০৫ সালে বঙ্গভঙ্গ হলো। পূর্ব বাংলা ও আসাম নিয়ে নতুন এক বঙ্গদেশ। ঢাকাকেন্দ্রিক মানুষেরা এই সিদ্ধান্তে আপ্লুত। আবার কলকাতাকেন্দ্রিক অনেকে অখুশি। শুরু করলেন প্রবল আন্দোলন। বর্জন করলেন ইংরেজদের পণ্য। আন্দোলনরত তরুণেরা, বলা যেতে পারে রজনীকান্তকে দিয়ে গানটি লিখিয়ে নেন। ইতিহাস যা-ই হোক, গানটি স্বদেশপ্রেমে উদ্বুদ্ধ হওয়ার এক জাগরণী গান, সর্বকালের জন্য প্রাসঙ্গিক।

মূলত ঈশ্বরের প্রতি ভক্তি ও স্বদেশ প্রেরণামূলক গানই বেশি লিখেছেন রজনীকান্ত। তাঁর আরও যেসব গান রয়েছে, এর মধ্যে বেশি গাওয়া হয়, 'তুমি নির্মল কর মঙ্গল করে, মলিন মর্ম মুছায়ে।' এ ছাড়া রয়েছে, 'আমি অকৃতি অধম বলেও তো কিছু কম করে মোরে দাওনি।'

কেবল গান কেন, কবিতাও তিনি কম লেখেননি। আমাদের ছোটবেলায় পড়া যেসব কবিতা, যেমন 'বাবুই পাখিরে ডাকি, বলিছে চড়াই/ তকুঁড়েঘরে থেকে কর শিল্পের বড়াই ?দ' 'স্বাধীনতার সুখ' নামে কবিতাটি তাঁরই লেখা। 'শৈশবে সদুপদেশ যাহার না রোচে, জীবনে তাহার কভু মূর্খতা না ঘোচে' কিংবা 'নদী কভু নাহি করে নিজ জলপান'; এই সবই তাঁর লেখা।

রজনীকান্তের জীবন যখন শেষ সময়ে এসে পড়েছে, হাসপাতালে বসে মৃত্যুর প্রার্থনা করছেন, তখন একবার রবীন্দ্রনাথকে দেখার সাধ হয় তাঁর। খবর পেয়ে আসেন কবিগুরু। সেদিন রজনীকান্তের শয্যাপাশে বসে রবীন্দ্রনাথ নিজে হারমোনিয়াম বাজান আর গান করেন রজনীর দুই সন্তান। সেদিন তাঁরা গেয়েছিলেন, 'বেলা যে ফুরায়ে যায়, খেলা কি ভাঙে না হায়।' চলে যাওয়ার সময় রবীন্দ্রনাথকে লিখলেন, 'আমায় আশীর্বাদ করুন, দয়াল শীঘ্র আমাকে তার কোলে নিয়ে যান।'

প্রয়াণ দিবসে আমরা এই মহান গীতিকবিকে স্মরণ করি, তাঁকে চর্চা করি। কারণ, তাঁরাই আমাদের আদি মহান মানুষ। ('প্রথম আলো'র সৌজন্যে)

বাংলা ভাষা ও বাঙালির পরিচয় নিয়ে বিভেদ ও বিভ্রান্তি

মজিবুর রহমান

সম্প্রতি আমাদের রাজ্যের বাঙালিদের ভিন রাজ্যে এমনকি কলকাতাতেও আক্রান্ত হতে দেখা গেল। কোথাও বাংলা ভাষায় কথা বলার জন্য বাঙালি পরিযায়ী শ্রমিকদের আটক করে তাদেরকে নাগরিকত্ব প্রমাণ করতে বলা হল। কোথাও বাঙালি বাংলা ভাষায় কথা বলার কারণে অবাঙালিদের হাতে প্রহৃত হল। কোথাও বাঙালিকে বাংলাদেশে 'পুশ ব্যাক' করা হল।বাংলাভাষী পরিযায়ী শ্রমিকদের এরূপ হেনস্তা হওয়ার ঘটনা একদম নতুন না হলেও এবার বাংলা ভাষা ও বাঙালির পরিচয় নিয়েই প্রশ্ন তোলা হয়েছে। একজন অবাঙালি রাজনৈতিক নেতা বলেছেন, বাংলাদেশের মানুষ যে ভাষায় কথা বলে তাকে বলা হয় বাংলাদেশি ভাষা। একটি রাজ্যের পুলিশ

আধিকারিকও অনুরূপ কথা লিখেছেন। বাংলা ভাষাকে বাংলাদেশি ভাষা বলে অভিহিত করে ওই অবাঙালি নেতা ও আধিকারিক অজ্ঞতার পরিচয় দিয়েছেন।আমরা সকলেই জানি, বাংলাদেশ ও পশ্চিমবঙ্গের সিংহভাগ মানুষের মাতৃভাষা বাংলা। বাংলাদেশের বাংলাভাষীরা যেমন বাঙালি তেমনি পশ্চিমবঙ্গের বাংলাভাষীরাও সমানভাবে বাঙালি। ভারতের ত্রিপুরা, অসম ও মেঘালয়েও বহুকাল আগে থেকে ভালো সংখ্যক বাঙালি স্থায়ীভাবে বসবাস করে। গোটা বিশ্বে বাঙালির সংখ্যা আনুমানিক ৩০ কোটি।

জনগোষ্ঠী ও জনপদের সঙ্গে ভাষার শধগত সাযুজ্য থাকতে পারে আবার নাও থাকতে পারে। যেমন, যে জনগোষ্ঠীর মাতৃভাষা বাংলা তাদেরকে বাংলাভাষী অথবা বাঙালি বলা হয়। কিন্তু যে জনগোষ্ঠীর মাতৃভাষা হিন্দি তাদেরকে হিন্দিভাষী বলেই ক্ষান্ত থাকতে হয়। বাংলাভাষীদের জন্য যেমন বাঙালি শধটি ব্যবহার করা যায় হিন্দিভাষীদের জন্য তেমন কোনো শধ ব্যবহার করার সুযোগ নেই। উর্দুভাষীদের জন্যেও একই কথা প্রযোজ্য। জনপদ বা স্থানিক পরিচয়ে যেমন বিহারের অধিবাসী বিহারি, গুজরাটের অধিবাসী গুজরাটি, রাজস্থানের অধিবাসী রাজস্থানী, ভারতের অধিবাসী ভারতীয় তেমনি বাংলাদেশের অধিবাসী বাংলাদেশি আর পশ্চিমবঙ্গের অধিবাসী পশ্চিমবঙ্গবাসী হিসেবে পরিচিত।

যেকোনো ভাষার একাধিক আঞ্চলিক রূপ থাকা সম্ভব। একটি ভাষার বিভিন্ন আঞ্চলিক রূপকে বলা হয় উপভাষা। এই উপভাষা ভাষা সাধারণত লেখার ক্ষেত্রে হয় না, হয় বলার ক্ষেত্রে। অর্থাৎ ভাষার লেখ্য রূপ এক থাকলেও বদলায় তার কথ্য রূপ। কলকাতা ও ঢাকার সাহিত্যিকদের লেখনী বা রচনাশৈলী প্রায় একই রকম হলেও এই দুই শহরের দুজন সাহিত্যিক যখন কথা বলেন তখন তাঁদের উচ্চারণগত ভিন্নতা স্পষ্ট হয়ে ওঠে। দুই শহরের সাধারণ মানুষের উচ্চারণের প্রভেদ আরও বেশি। তবে এই পার্থক্য শুধুমাত্র দুটি দেশের দুটি শহরের মধ্যেই নয়, একই দেশের বিভিন্ন শহর বা এলাকার মধ্যেও হয়ে থাকে। মুর্শিদাবাদ জেলার মানুষের কথা বলার ধরন কলকাতা বা বর্ধমানের লোকেদের থেকে বেশ কিছুটা আলাদা। বাংলাদেশের ঢাকা, চট্টগ্রাম, খুলনা প্রভৃতি এলাকার অধিবাসীদের বাংলা উচ্চারণেও ফারাক রয়েছে।

প্রতিটি ভাষা একাধিক উৎস থেকে শব্দ সংগ্রহ করে। উৎসগুলোর মধ্যে একটি হল বিদেশি ভাষা। যেমন, ইংরেজি ভাষা রোমের রোমান, গ্রীসের গ্রীক ও ফ্রান্সের ফরাসি ভাষা থেকে প্রচুর শব্দ গ্রহণ করেছে। ইংরেজি শব্দ ভাণ্ডারের স্ফীতিতে উপমহাদেশের বাংলা ও হিন্দি শব্দেরও অবদান রয়েছে। গুরু, পণ্ডিত, জগন্নাথ, ঘেরাও, দাদাগিরি, বনধ প্রভৃতি ভারতীয় শব্দ ইংরেজি সাহিত্য ও সংবাদমাধ্যমে জায়গা করে নিয়েছে। নতুন শব্দ গঠনের প্রক্রিয়াও কখনও রুদ্ধ হয় না। এব্যাপারে সাহিত্যিক ও সাংবাদিকরা অগ্রণী ভূমিকা পালন করেন। সম্প্রতি আমাদের রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী তথা স্বঘোষিত সাহিত্যিক একটি নতুন শব্দের জন্ম দিয়েছেন- শুভনন্দন।

বাংলা ভাষায় আনুমানিক এক লাখ শব্দ আছে বলে ধরা হয়। এর মধ্যে তৎসম শব্দ (সংস্কৃত ভাষা থেকে সরাসরি বাংলা ভাষায় এসেছে) ২৮ শতাংশ, অর্ধ-তৎসম শব্দ (সংস্কৃত ভাষা থেকে কিছু পরিবর্তন সহ বাংলা ভাষায় এসেছে) ১২ শতাংশ, তদ্ভব শব্দ (সংস্কৃত ভাষা থেকে প্রাকৃত ভাষার মাধ্যমে পরিবর্তিত হয়ে বাংলা ভাষায় এসেছে) ১৬ শতাংশ, দেশি শব্দ (বাংলা ভাষার নিজস্ব শধ) ১৬ শতাংশ এবং বিদেশি শব্দ (ভারতীয় উপমহাদেশের বাইরে থেকে বাংলা শব্দ ভাণ্ডারে প্রবেশ করেছে) ২৮ শতাংশ বা ২৮ হাজার। বাংলা ভাষায় বিদেশি শব্দের মধ্যে ইংরেজি, আরবি, ফার্সি, ফরাসি, পর্তুগিজ, ওলন্দাজ ও তুর্কির সংখ্যা বেশি।

বাংলা তথা অন্যান্য ভারতীয় ভাষায় বহুল পরিমাণে ইংরেজি শব্দ থাকার একটা বড় কারণ হল উপমহাদেশে প্রায় দুশো বছরের ব্রিটিশ শাসন। পৃথক ভাষাভাষীর মানুষ দীর্ঘদিন পাশাপাশি বসবাস করলে সাংস্কৃতিক লেনদেনের অংশ হিসেবে পরস্পরের ভাষা সম্পর্কে পরিচিত হয় এবং লেখা ও বলার সময় তা ব্যবহার করে। দীর্ঘদিনের ইংরেজ শাসনের ফল হিসেবে আজও আমাদের দেশে প্রশাসনের কাজে এবং শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে পঠনপাঠনে ইংরেজি সর্বাধিক ব্যবহৃত ভাষা হিসেবে রয়ে গেছে। বাংলা তথা ভারতের কিছু কিছু অংশে ফরাসি, পর্তুগিজ ও ওলন্দাজদের উপনিবেশ ছিল। এজন্য এই ভাষাগুলো থেকেও কিছু শব্দ বাংলা ভাষায় এসেছে। আরবি, ফার্সি ও তুর্কি ভাষার ক্ষেত্রেও প্রায় একই ঘটনা ঘটেছে। এগুলো মূলত মুসলিম দেশগুলোর প্রধান ভাষা। আমরা সকলেই জানি, ভারতে ইংরেজ শাসন প্রতিষ্ঠার পূর্বে মুসলিম সম্রাট, সুলতান ও নবাবদের ভারত শাসনের দীর্ঘ ইতিহাস রয়েছে। স্বাভাবিকভাবেই শাসকের ভাষার অনেক শব্দ এদেশের ভাষাসমূহের শব্দভাণ্ডারে অন্তর্ভুক্ত হয়েছে। ফার্সি ১৮৩৫ সাল পর্যন্ত ভারতে সরকারি কাজকর্মের ভাষা হিসেবে ব্যবহৃত হত। আরবি আরবদেশের ভাষা। বাংলা শধভাণ্ডারে আরবি, ফার্সির উল্লেখযোগ্য উপস্থিতি সম্পর্কে বাংলা ভাষা-সাহিত্যের সর্বশ্রেষ্ঠ ব্যক্তিত্ব রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর বলেছেন, 'বাংলা ভাষায় পারসী আরবি শধের সংখ্যা কম নয় কিন্তু তারা সহজেই স্থান পেয়েছে।... মুসলমান সমাজের নিত্য ব্যবহৃত শব্দ যদি ভাষায় স্বতই প্রবেশলাভ করে তবে তাতে সাহিত্যের ক্ষতি হবে না, বরং বংশবৃদ্ধি হবে, বাংলা ভাষার অভিব্যক্তির ইতিহাসে তার দৃষ্টান্ত আছে।' বাংলা ভাষায় নিত্যব্যবহার্য কয়েকটি আরবি ও ফার্সি শধের উদাহরণ দেওয়া যাক।

আরবি- আইন, আদালত, আসর, আসামি, আতর, আমানত, ইমারত, ইজ্জত, ইস্তফা, উকিল, ওকালতি, ওজন, কসরত, কৈফিয়ত, কলম, কসাই, কাহিল, কেচ্ছা, খবর, খসড়া, খতম, খাজনা, খালাস, খারিজ, খুন, খেলাপ, খেসারত, গরিব, গোলাম, গরমিল, গাফিলতি, জজ, জমা, জমি, জরিপ, জবাব, জলসা, জল্লাদ, জুলুম, জাহাজ, জালিয়াতি, তবলা, তারিখ, তালাক, তাগাদা, তালুক, তাস, দখল, দাখিল, দুনিয়া, দোয়াত, দৌলত, দালাল, নকল, নগদ, নবাব, নায়েব, নেশা, নকশা, নাজেহাল ইত্যাদি।

ফার্সি- অন্দর, আন্দাজ, আওয়াজ, আয়না, আরাম, আলাদা, আমির, উজির, আমদানি, রপ্তানি, কাগজ, কেদারা, কারবার, কারখানা, খাতা, খানকা, চশমা, চাকর, চাদর, চিঠি, জায়গা, জরিপ, দরজা, দোকান, দুনিয়া, দস্তানা, দরগা, দরবার, বাগান, বরফ, গোলাপ, শিশি, সিন্দুক, নালিশ, নামাজ, রোজা, সর্দার, সেলামি ইত্যাদি। এই তালিকা থেকে বুঝতে অসুবিধা হয় না যে, বাংলা ভাষায় আরবি-ফার্সি শধের ব্যবহার কত ব্যাপক এবং সেই সঙ্গে স্বচ্ছন্দ। শধগুলোর বহুমুখী ব্যবহারও লক্ষণীয়। ধর্মীয়, ব্যবসায়িক, সামাজিক, বিচারিক ও সাধারণ ব্যবহারিক সব ধরনের শব্দই আছে। জাতি-ধর্ম, সাক্ষর-নিরক্ষর নির্বিশেষে সকল বাঙালি অত্যন্ত সাবলীল ভাবে যুগ যুগ ধরে শব্দগুলো ব্যবহার করছে। এজন্য শব্দগুলো বাংলা ভাষা ও সংস্কৃতির অবিচ্ছেদ্য অংশ হয়ে গেছে।

জনসংখ্যার দিক থেকে ৩০ কোটি বাঙালির মধ্যে ২২ কোটির বেশি মুসলমান। অর্থাৎ, বাংলা ভাষায় আরবি-ফার্সি প্রভৃতি 'মুসলমানি' শব্দের প্রাধান্য থাকার পাশাপাশি বাঙ্গালির মধ্যে মুসলমানদের সংখ্যাধিক্য রয়েছে। এজন্য হিন্দুত্ববাদী সাম্প্রদায়িক দৃষ্টিভঙ্গি নিয়ে চলা কিছু রাজনৈতিক দলের অবাঙালি অন্ধভক্তরা বাঙালি ও মুসলমান এবং বাংলা ভাষা ও মুসলমানের ভাষাকে সমার্থক বিবেচনা করে। তারা বাঙালিকে বাংলাদেশি আর বাংলা ভাষাকে বাংলাদেশি ভাষা বলে অভিহিত করে তাদের অজ্ঞতা ও অভিসন্ধির প্রকাশ ঘটায়। তারা বাংলা ভাষা ও বাঙালির 'মুসলমানীত্ব' নিয়ে অসন্তোষ ব্যক্ত করতে বাংলা ভাষা ও বাঙালিকেই আক্রমণ করে বসে। বিপরীতক্রমে মুসলিম মৌলবাদীরা বাংলা ভাষার 'হিন্দুয়ানী' নিয়ে অসন্তুষ্ট। পাকিস্তান আমলে পূর্ববঙ্গে প্রতিষ্ঠিত কবি-সাহিত্যিকদের লেখা থেকে শ্মশান, ঈশ্বর, ভগবান, আমন্ত্রণ, অভিশাপ, প্রার্থনা, প্রভাত, সন্ধ্যা প্রভৃতি 'হিন্দু' শব্দ যথাক্রমে কবরস্থান, আল্লাহ, খোদা, দাওয়াত, গজব, দোয়া, ফজর, মাগরিব প্রভৃতি 'মুসলিম' শধের দ্বারা প্রতিস্থাপন করার চেষ্টা করা হয়। এখনও মুসলিমদের একাংশ 'বন্দে মাতরম' শব্দবন্ধকে ধর্মবিরোধী বলে মনে করে।

বাংলা ভাষা ও বাঙালিদের বহুবার কোণঠাসা করার চেষ্টা করা হয়েছে। ব্রিটিশ আমলে ১৯০৫ সালে বঙ্গভঙ্গ তার একটি বড় দৃষ্টান্ত। বাঙালির ধারাবাহিক ও ঐক্যবদ্ধ আন্দোলনের চাপে ১৯১১ সালে বঙ্গভঙ্গ রদ করা হলেও ১৯১২ সালে ব্রিটিশ ভারতের রাজধানী কলকাতা থেকে দিল্লিতে স্থানান্তরিত করে বাঙালির ওপর প্রতিশোধ নেওয়া হয়। ১৯৪৭ সালে স্বাধীনতার সময় কংগ্রেস ও লীগের অবাঙালি নেতৃবৃন্দ বঙ্গ প্রদেশকে বিভক্ত করার পক্ষে অবস্থান গ্রহণ করেন। নবগঠিত পাকিস্তানের অবাঙালি নেতৃত্ব বাংলা ভাষার শ্রেষ্ঠত্ব ও বাঙালির সংখ্যাধিক্যকে পাত্তা না দিয়ে উর্দুকে এক ও একমাত্র রাষ্ট্রভাষা করতে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ হন। এর ফলশ্রুতিতে ২১শে ফেব্রুয়ারি, ১৯৫২ ঢাকার রাজপথে ইতিহাস রচিত হয়। বাংলা ভাষার মর্যাদা রক্ষায় প্রাণ বিসর্জন দেন পাঁচজন বাঙালি। ভারতের আসাম রাজ্যে অসমিয়া জনগোষ্ঠী বাঙালির অধিকার খর্ব করার জন্য বাংলা ভাষাকে নিশানা করে। প্রচলিত নিয়ম লঙ্ঘন করে অসমিয়া ভাষাকে একমাত্র রাজ্য সরকারি ভাষার স্বীকৃতি দিয়ে আইন তৈরি করা হয়। ১৯শে মে, ১৯৬১ বাংলা ভাষাকে অপমান করার বিরুদ্ধে আন্দোলনে সামিল হয়ে এগারোজন বাঙালির প্রাণদানের সাক্ষী থাকে শিলচর। লক্ষণীয় বিষয় হল, ২১শে ফেব্রুয়ারির ভাষা শহিদরা যেমন সকলেই মুসলমান ১৯শে মে'র ভাষা শহিদরা তেমনি সকলেই হিন্দু। আসলে তাঁরা ধর্মে হিন্দু-মুসলমান হলেও জাতিতে সবাই বাঙালি। আজও হিন্দি ভাষার আধিপত্যের বিরুদ্ধে বাংলা ভাষার পক্ষে বাঙালির লড়াই চলছে।

ভারতীয় উপমহাদেশে বাংলা ভাষার সাফল্য ও শ্রেষ্ঠত্ব নিয়ে প্রশ্ন তোলার কোনো অবকাশ নেই। বাংলা একটি ধ্রুপদী ভাষা। হাজার বছরের পুরনো সাহিত্য সম্ভার রয়েছে। বাংলা ভাষায় প্রকাশিত বইপত্র ও পত্রপত্রিকার সংখ্যা প্রচুর। কলকাতা ও ঢাকায় প্রতি বছর আন্তর্জাতিক বইমেলা অনুষ্ঠিত হয়। বাংলা ভাষার কবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর (১৯১৩) আজও পর্যন্ত সাহিত্যে একমাত্র ভারতীয় নোবেলজয়ী। অর্থনীতিতে রয়েছেন দুজন বাঙালি নোবেলজয়ী- অমর্ত্য সেন (১৯৯৮) ও অভিজিৎ বিনায়ক বন্দ্যোপাধ্যায় (১৯১৯)। শান্তিতে নোবেল জয় করেছেন বাঙালি অর্থনীতিবিদ মুহাম্মদ ইউনূস (২০০৬)। জন্মসূত্রে অবাঙালি হলেও কর্মসূত্রে কলকাতাবাসী মাদার টেরেজা (১৯৭৯) পেয়েছেন নোবেল শান্তি পুরস্কার। চলচ্চিত্র জগতের সর্বশ্রেষ্ঠ পুরস্কার অস্কার পেয়েছেন বাঙালি পরিচালক সত্যজিৎ রায় (১৯৯২)। আর কোনো ভারতীয় মাতৃভাষা এত সুসন্তান জন্ম দেওয়ার দাবি করতে পারে?

বাংলা ভাষা ও বাঙালি জাতির পরিচয় একটি বৃহৎ ব্যাপার। ধর্মীয় ও রাজনৈতিক কর্মকাণ্ডের অনেক ওপরে এর স্থান। বাংলা ভাষা ও বাঙালি জাতিকে হিন্দু-মুসলমানে বিভক্ত করে দেখার বদলে সংযুক্ত করে দেখতে হবে। একটি সজীব ও সমৃদ্ধ ভাষা হিসেবে বাংলার এবং সুপ্রাচীন ভাষিক জাতি হিসেবে বাঙালির যেকোনো ধরনের সংকীর্ণতা এবং ষড়যন্ত্রের বিরুদ্ধে লড়াই করে সফলতা অর্জন করার সামর্থ্য আছে, তা একাধিকবার প্রমাণ হয়েছে। সামনের দিনগুলোতেও তার অন্যথা হবে না বলেই আশা করা যায়।

(লেখক মুর্শিদাবাদ জেলার কাবিলপুর হাই স্কুলের প্রধান শিক্ষক)

'বাংলা'কে ভাষার তালিকা থেকে বাদ দেওয়া বিজেপির এক কৌশলী পদক্ষেপ

মনিরুল হক

কী অদ্ভুত একটা অবস্থা! কেউ 'জল আর পানি' তত্ব আওড়াচ্ছেন, কেউ অপাঙকতেয় 'পরিযায়ী' থেকে মুখ ফিরিয়ে 'প্রবাসী'র গুণকীর্তন করছেন, কেউ 'পূর্ব-পশ্চিম-উত্তর-দক্ষিণ'-এর ডায়লেক্ট

নিয়ে পড়ে আছেন, কেউ উপভোগ করছেন বিজেপি আর তৃণমূলের সেটিং তত্ব, কেউ আবার দেখছেন এই দুই দলের বিরোধের তত্ব, আর যাঁরা আরও সরেস তাঁরা প্রচার করছেন 'বাঙালি আর বাং-আলি'-র দর্শন ভাবনা।

সবার জানা অন্ধের হস্তি দর্শনের গল্পটা আবার মনে পড়ল। একদল অন্ধ মানুষ হাতি দেখতে এসেছেন। বলা বাহুল্য, সবাই হাতের স্পর্শে অনুভব করছেন হাতিকে। কেউ পা, কেউ লেজ, কেউ শুঁড়, কেউ কান স্পর্শ করছেন। গোটা একটা হাতিকে উপলব্ধি করা তাঁদের কারও পক্ষেই সম্ভব হচ্ছে না কিন্তু বিশাল এক দেহের সামান্য অংশে স্পর্শ করার অভিজ্ঞতা দিয়েই তাঁরা যাঁর যাঁর মতো করে হাতির আকৃতির বর্ণনা করছেন। স্বভাবিক ভাবেই পূর্ণাঙ্গভাবে হাতির বর্ণনা কেউ দিতে পারছেন না বরং তাঁদের বর্ণনা হয়ে যাচ্ছে উদ্ভট ও পরস্পরবিরোধী। আমরাও এখন এক হস্তি দর্শন পর্বের মধ্য দিয়ে যাচ্ছি। পার্থক্য শুধু এই যে হস্তির জায়গায় আছে বাংলাভাষা ও বাংলাভাষী মানুষজন আর অন্ধদের পরিবর্তে এক দঙ্গল চক্ষুষ্মান বাঙালি! তবে তাঁরা আচরণ করছেন অন্ধের মতো আর তাঁদের সামগ্রিক দর্শন- অন্ধ হলে প্রলয় বন্ধ হয়।

সে অনেকদিন আগের কথা। একটা প্রেমের শ্লোগান উঠেছিল হিন্দি-হিন্দু-হিন্দুস্তান। সেই তখনকার কথা ছেড়ে দিন, আদতে সেটা যে এক চরম অপ্রেম আর আধিপত্যবাদের আগ্রাসনের মন্ত্র তা এখনও অনেকে বুঝতে চাইছেন না। এই শ্লোগানটুকু বুঝলেই ইদানিং কালে বিজেপি শাষিত রাজ্যগুলিতে বাঙালি মানুষজনদের হেনস্থা, অপমান, মারধোর করা বা ষাঁড়ের মতো ঠেলে-গুতিয়ে অথবা বেলচায় নোংরা তুলে ডাষ্টবিনে ছুঁড়ে দেওয়ার মতো করে দেশের সীমানার বাইরে পার করে দেওয়ার ঘটনাগুলিকে সহজেই ব্যাখ্যা করা যেত। কিন্তু আমরা ওসব বুঝব কেন, আমরা না গব্বিত বাঙালি ! আর তা ছাড়া ওইভাবে ভাবলে তো বিজেপির কথা আসে, বিজেপিকে নিন্দা করতে হয়। আমরা তা করব কেন, ছি।

হিন্দি ভাষাকে উত্তর ভারতের ন্যায় পূর্ব ভারত ও দক্ষিণ ভারতের প্রধান ভাষা হিসাবে প্রচলনের চেষ্টা আগে যে হয় নি তা নয়। কিন্তু আগের সরকারগুলি বুঝেছিল সেটা করা সম্ভব নয়, করা উচিত-ও নয়। তাঁরা একটা মধ্যপন্থা অবলম্বন করে চলছিলেন। কিন্তু বিজেপি দিল্লীতে ক্ষমতায় আসার পর থেকেই জোর করে অথবা ছলে-বলে-কৌশলে হিন্দিকে রাষ্ট্রভাষা হিসাবে প্রতিষ্ঠিত করার প্রচেষ্টা নতুন করে শুরু হয়। এজন্য যতদূর যাওয়ার দরকার, তারা যেতে চায়; আর যা যা করার দরকার সব তারা করতে চায়; যে কথা বলে মানুষকে বিভ্রান্ত করা যায়, নির্লজ্জভাবে দন্ত বিকশিত করে তা তারা বলে দেয়। অমিত মালব্য কোন X–Y বা Z নন; তিনি কেন্দ্রীয় বিজেপির অন্যতম প্রধান নেতা, বিকৃতি শিরোমণি বিজেপি আই টি সেলের প্রধান এবং পশ্চিমবঙ্গ বিজেপির সহ-পর্যবেক্ষক। তিনি অবলীলায় বলে দিলেন- 'বাংলা' বলে কোন ভাষা নেই। মুখ ফসকে বলে ফেলেছেন এমন নয়, এটি বিজেপির সুচিন্তিত দৃষ্টিভঙ্গির প্রকাশ।

ক্ষেত্র প্রস্তুত করেছেন দিল্লি পুলিশ। তাঁরা দিল্লিকে আবর্জনামুক্ত, ঝুপড়িমুক্ত, অপরাধমুক্ত, উচ্চ মধ্যবিত্ত ,ধনীদের শহরে রূপান্তরিত করার প্রতিজ্ঞা করেছেন। আর এই কাজ করতে গিয়ে তাঁরা দক্ষিণ ভারতীয় আর বাঙালিদের প্রেমে পড়ে গিয়েছেন। বাঙালিপ্রেম আবার একটু বেশি! রাস্তার বেওয়ারিশ কুকুরদের যে ভাবে কর্পোরেশনের লোকজন ধরে নিয়ে যায় সেইভাবে তাঁরা বাঙালিদের ধরে নিয়ে যাচ্ছেন। প্রথমে কুৎসিত গালাগালি, তারপর ঠ্যাঙানি, তারপর কাগজ দেখা তারপর সে কাগজ কেড়ে নেওয়া, ছিঁড়ে ফেলা এবং এরপর চোখ বুজে বাংলাদেশে ঠেলে দেওয়া। সারা দেশ জুড়ে নিন্দার ঢেউ উঠছে তাই পুলিশ এবার একটু সদয়। আগস্টের প্রথম সপ্তাহে আটজন বাঙালিকে আটক করে দিল্লি পুলিশ। সন্দেহ, তাঁরা বাংলাদেশি কারণ তাঁদের কাগজপত্র বাংলা ভাষায় লেখা। এইসব কাগজপত্র হিন্দি বা ইংরেজিতে অনুবাদ করতে হবে। সেই অনুরোধ সম্বলিত চিঠিতে 'বাংলাদেশি ভাষায় লেখা পাঠ্য' অনুবাদ করার জন্য 'বাংলাদেশি ভাষায় দক্ষ' একজন অনুবাদকের খোঁজ করা হয়েছে। দিল্লি পুলিশের জ্ঞান এবং ভাষ্য অনুযায়ী 'বাংলা' বলে কোনো ভাষা নেই তবে 'বাংলাদেশি' ভাষার অস্তিত্ব আছে। এর জন্য দিল্লি পুলিশের যে ন্যূনতম উপহার পাওয়ার কথা তা হল শো-কজের চিঠি কিন্তু তাঁরা পেলেন জবরদস্ত এক পিঠ চাপড়ানি। মালব্যজী বললেন, বাংলা বলে কোনো ভাষা নেই আর আমাদের শমীক সংস্কৃতি ভট্টাচার্য বললেন, দিল্লি পুলিশ একদম সঠিক শধ প্রয়োগ করেছেন!

দিল্লি পুলিশ- অমিত- শমিক- বিজেপির শিরস্ত্রাণে এক নতুন পালক যুক্ত হল কারণ তাঁরা এক নতুন ভাষার আবিষ্কারক! সারা পৃথিবী জানে, 'বাংলাদেশি ভাষা' বলে কোনো ভাষাগত সত্তা নেই। খোদ বাংলাদেশের সংবিধান বলছে, বাংলাদেশের জাতীয় ভাষা 'বাংলা'। বাংলাদেশের প্রবাদপ্রতিম কবি শামসুর রহমানের প্রয়াণের পর বিবিসি তাদের প্রতিবেদনে তাঁকে বাংলাদেশি সাহিত্যের পরিবর্তে 'বাংলা' সাহিত্যের কবি হিসাবে বর্ণনা করে। চলচ্চিত্র ও শিল্পকলা বিষয়ক প্রকাশনা হলিউড রিপোর্টার বাংলাদেশের লেখক চলচ্চিত্রকার হুমায়ুন আহমেদকে 'বিখ্যাত বাঙালি লেখক' হিসাবেই বর্ণনা করেছেন।

বাংলায় একটা কথা আছে 'হাত অন্তর মাটি, দেশ অন্তর বুলি'। এ কথাটার নানারকম ব্যাখ্যা আছে। তার একটি হল, মাটির রূপ ও প্রকৃতির বিভিন্নতা আমরা অল্প দূরত্বের মধ্যেই প্রত্যক্ষ করতে পারি।আর এক জনপদ থেকে অন্য এক জনপদে গেলেই ভাষার রূপান্তর ঘটে। আসলে পৃথিবীর সব প্রধান ভাষারই অসংখ্য উপভাষা থাকে। উপভাষা মূল ভাষাকেই সমৃদ্ধ করে। তাই এই উপভাষাগুলিকে সংখ্যা দিয়ে বা রূপ দিয়ে নির্দিষ্ট করা যায় না। ভাষার থাকে আঞ্চলিক উপভাষা, সামাজিক উপভাষা, মানুষের স্তরবিন্যাস জনিত উপভাষা। এই উপভাষাগুলিরও থাকে নানান ভাগ। আবার বাঙালিরা যখন পুরুষ পরম্পরায় অন্য রাজ্যে গিয়ে

বাস করে তখন তারা সেই রাজ্যের ভাষা আয়ত্ব করে, সেই ভাষায় সাবলীল হয়ে ওঠে। ঠিক তেমনি বাংলায় যেসব বিহারী, ওড়িয়া, মাড়োয়ারী, গুজরাটি, পাঞ্জাবি বসবাস করেন তাঁরাও বাংলা ভাষা আয়ত্ব করে নেন।

অমিত মালব্য তাঁর ড়-এ সিলেটি উপ ভাষার উল্লেখ করে তাকে বাংলা ও বাঙালি থেকে আলাদা করতে চেয়েছেন। এতে সবচেয়ে জোরালো প্রতিবাদ এসেছে আসাম, ত্রিপুরা ও মেঘালয়ের সিলেটি জনমানস থেকে। শিলচরের বাসিন্দা বিজেপির রাজ্যসভার সদস্য কণাদ পুরকায়স্থ অমিত মালব্যের বক্তব্যের তীব্র নিন্দ করে বলেছেন, আপনাদের জানা উচিত বরাক উপত্যকায় সিলেটভাষী বাঙালিরা সংখ্যাগরিষ্ঠ। ওই দলের প্রাক্তন সাংসদ রাজদীপ রায় বলেছেন, বরাক-ত্রিপুরা-মেঘালয়ে অন্তত ৭০ লক্ষ বাঙালি বাস করেন যাঁদের ভাষা সিলেটি। তাই সিলেটি-বাংলা-বাঙালিকে আলাদা করা যায় না।

আমাদের সংবিধানের অষ্টম তফশিলে মর্যাদার সঙ্গে 'বাংলা' ভাষাকে স্থান দেওয়া হয়েছে। বেশিদিন হয় নি, গত বছরের অক্টোবর মাসে কেন্দ্রীয় মন্ত্রীসভা বাংলা ভাষা কে ধ্রুপদী ভাষার মর্যাদা প্রদান করেছে। বাংলা ভাষাকে ভারতের প্রাচীন সাংস্কৃতিক উত্তরাধিকারের রক্ষক হিসাবে স্বীকৃতি দেওয়া হয়েছে এবং বলা হয়েছে এই ভাষার সমৃদ্ধ ইতিহাস সাহিত্য এবং ঐতিহ্যকে সংরক্ষণ করছে। এখন প্রশ্ন হচ্ছে তাহলে অমিতবাবুরা ভাষা হিসাবে বাংলাকে উড়িয়ে দিচ্ছেন কেন? উত্তর হল, -

১) এটি হিন্দিকে ভাষা হিসাবে চাপিয়ে দেওয়ার একটা প্রক্রিয়া।

২) বাংলা ভাষাকে দুভাগে ভাগ করে দেখানো। একটি 'বাংলাদেশি বাংলা ভাষা' যাকে মুসলিমদের ভাষা হিসাবে পরিচয় করানো যাবে এবং অপরটি হবে 'হিন্দি আশ্রিত বাংলা' যা বাঙালি হিন্দুদের ভাষা বলে পরিচিত হবে। এবং এই প্রক্রিয়ায় ভাষাগত ভাবে পশ্চিমবঙ্গের বাঙালিদের মধ্যে বিভেদ তৈরি করা যাবে।

এই ফর্মূলা অনুযায়ীই আসামের বিজেপি মুখ্যমন্ত্রী হিমন্ত বিশ্বশর্মা আসামের প্রেক্ষিতে আসামবাসীদের উদ্দেশ্যে বলেছেন, বাংলাকে মাতৃভাষা হিসাবে দেখালে বিদেশি সনাক্তকরণে সুবিধা হবে।

৩) বাঙালিদের মধ্যে আরোপিত এই বিভেদকে কাজে লাগিয়ে হিন্দু ঐক্য গড়ে তোলা। যদি এই ঐক্য গড়ে তোলা যায় তাহলে ভোটিং মেশিনে তার প্রতিফলন উপভোগ করা।

এখন তামাম পশ্চিমবঙ্গবাসীকে বুঝে নিতে হবে তাঁরা বিজেপির এই কূট চালের কাছে আত্মসমর্পণ করে এক 'অদ্ভুত আঁধার'কে আবাহন করবেন না প্রতিবাদ-প্রতিরোধে বিজেপিকে সমুচিত শিক্ষা দেবেন।

ট্রাম্পের শুল্কবৃদ্ধির অভিঘাত ভারতীয় শিল্প বাণিজ্যে এসে পড়তে শুরু করেছে

সৌর বসু

আলাস্কায় ট্রাম্প এবং পুটিনের বৈঠক ছিল অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ । ভারতের নজর ছিল এই বৈঠকের উপর ।বৈঠক খুব ফলপ্রসূ হয়েছে তা এখনই বলা যাচ্ছে না। বরং বলা যেতে পারে যে এই বৈঠক রাশিয়ার পক্ষে স্বস্তিদায়ক হয়েছে। বৈঠক সমাপ্তির পরে প্রেসিডেন্ট ট্রাম্প এবং ভ্লাদিমির পুতিন দুজনেই বলেছেন বৈঠক অত্যন্ত ইতিবাচক। ট্রাম্প বলেছেন যে আমরা অনেক বিষয়ে একমত হয়েছি এবং অনেকটা অগ্রগতি হয়েছে। তবে এখনো কিছু বিষয় অমীমাংসিত থেকে গেছে। পুতিনও বলেছেন যে আমরা পরস্পরের প্রতি শ্রদ্ধাশীল থেকে আলোচনা করেছি। আলোচনা গঠনমূলক হয়েছে।

বৈঠক পরবর্তী সময়ে একটি সাক্ষাৎকারে ট্রাম্প ফক্স নিউজ কে বলেছেন যে রাশিয়া একটি বৃহৎ শক্তি। রাশিয়ার সঙ্গে বৈঠকের সময় জেলেনস্কিকে সে কথা স্মরণে রাখতে হবে। প্রয়োজনে রাশিয়ার কিছু শর্তকে মেনে নিতে হবে। ইউরোপীয় ইউনিয়ন ভুক্ত দেশগুলি আলাস্কার বৈঠকের ব্যাপারে যথেষ্ট সন্ধিহান।

সম্প্রতি ওয়াশিংটনে ডোনাল্ড ট্রাম্পের সঙ্গে ইউরোপীয় রাষ্ট্রপ্রধানদের বৈঠকের সময় ট্রাম্প ইঙ্গিত দেন যে রাশিয়া এবং ইউক্রেনের মধ্যে শান্তি প্রতিষ্ঠার জন্য ডনবাস অঞ্চলের উপর রাশিয়ার নিয়ন্ত্রণ কায়েম করতে হবে।

মোটের উপর বিগত ১০-১৫ দিন ধরে বিভিন্ন রাষ্ট্রপ্রধানের মধ্যে যে বৈঠকগুলি অনুষ্ঠিত হলো সেখান থেকে, রাশিয়া এবং ইউক্রেনের মধ্যে শান্তি প্রতিষ্ঠার ব্যাপারে কোন দিশা এখনো দেখতে পাওয়া যাচ্ছে না। তবে এই বৈঠক গুলির মধ্যে দিয়ে আমেরিকার প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প, ইউরোপের শক্তিশালী রাষ্ট্র গুলির সঙ্গে এবং চীনের সঙ্গে একটি সমঝোতা তৈরি করার দিকে এগোচ্ছেন , তার ইঙ্গিত খুব স্পষ্ট। বিশেষ করে আলাস্কার বৈঠকে রাশিয়ার কূটনৈতিক জয় হয়েছে বলে বিশেষজ্ঞরা মনে করছেন। মার্কিন সংবাদপত্র ওয়াশিংটন পোস্ট একই মত পোষণ করে। ডোনাল্ড ট্রাম্প এ বৈঠকের আগে বলেছিলেন যে রাশিয়া এবং ইউক্রেনের যুদ্ধ বিরতির পর আলোচনার পরিস্থিতি তৈরি হতে পারে। রাশিয়া যদি এ ব্যাপারে সম্মত না হয় তাহলে রাশিয়ার পক্ষে তা বিপদজনক হতে পারে বলে বৈঠকের আগে হুমকি প্রদান করেছিলেন ডোনাল্ড ট্রাম্প। কিন্তু আলাস্কার বৈঠকে , সেই হুমকির কথা সম্পূর্ণ বিস্মৃত হয়ে, পুতিনের শর্তসাপেক্ষে শান্তি আলোচনায় রাজি হন। স্বাভাবিকভাবেই ওয়াশিংটন পোস্ট, নিউ ইয়র্ক টাইমস প্রমুখ মার্কিনী সংবাদপত্র গুলি আলাস্কা বৈঠকে ট্রাম্পের ভূমিকার সমালোচনা করেছে।

অন্যদিকে এই বৈঠকের উপর ভারতের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির তীক্ষ্ণ নজর ছিল। ভারত সরকার আশা করেছিল যে বৈঠক যদি ফলপ্রসু হয় অর্থাৎ এই বৈঠকের মাধ্যমে যদি জেলেনস্কি এবং পুতিনের শান্তি স্থাপনের পথ প্রশস্ত হয় তাহলে হয়তো ভারতের উপর যে অতিরিক্ত ২৫ শতাংশ শুল্ক চাপানো হয়েছে, তার একটা সমাধান সূত্র পাওয়া যাবে।

কিন্তু ডোনাল্ড ট্রাম্প এখন বিভিন্ন বৈঠকের মাধ্যমে ইউরোপীয় ইউনিয়নের অন্তর্ভুক্ত রাষ্ট্রগুলির সঙ্গে , যুক্ত রাজ্যের সঙ্গে এবং চীন ও রাশিয়ার সঙ্গে সংযোগ স্থাপন করতে চাইছেন। তার অন্যতম লক্ষ্য রাশিয়া এবং ইউক্রেনের মধ্যে শান্তি স্থাপনের মাধ্যমে নিজের অবস্থানকে সুদৃঢ় করে তোলা। ভারতের উপর চাপানো অতিরিক্ত ২৫ শতাংশ শুল্ক তার ক্ষমতার আস্ফালন ভিন্ন অন্য কিছু নয়। ভারতের ভ্রান্ত পররাষ্ট্র নীতির ফলে চূড়ান্ত খোসামোদ করেও ভারত আজ ট্রাম্পের আস্থা হারিয়েছে। ডোনাল্ড ট্রাম্প বলেছেন ভারতের মৃত অর্থনীতির কি হলো না হলো সে বিষয়ে তিনি আদৌ চিন্তিত নন। আন্তর্জাতিক বাণিজ্য ওয়ার্ল্ড ট্রেড অর্গানাইজেশনের নীতি অনুযায়ী পরিচালিত হতো। বিভিন্ন রাষ্ট্রের মধ্যে আলোচনার মাধ্যমে চুক্তি নির্ধারিত হতো। ট্রাম্প দ্বিতীয় দফায় ক্ষমতায় আসার পর আন্তর্জাতিক বাণিজ্যের নিয়ম লঙ্ঘন করে একতরফা ভাবে শুল্ক চাপানোর কাজ শুরু করেছেন। প্রকৃতপক্ষে যে সমস্ত রাষ্ট্রের সঙ্গে তার বাণিজ্যিক ঘাটতি আছে, সেই সমস্ত রাষ্ট্রের উপর তিনি অতিরিক্ত হারে শুল্ক চাপাচ্ছেন। ভারতের সঙ্গে আমেরিকার বাণিজ্যের ক্ষেত্রে ভারতের রপ্তানির পরিমাণ, আমদানি থেকে বেশি। অর্থাৎ ভারত আমেরিকার সঙ্গে বাণিজ্যের ক্ষেত্রে উদ্বৃত্ত রাষ্ট্র। দ্বিপাক্ষিক বাণিজ্যের ক্ষেত্রে কোন রাষ্ট্রের বাণিজ্যিক ঘাটতি থাকলে সে তার ইচ্ছামত শুল্ক আরোপ করতে পারে না । আন্তর্জাতিক বাণিজ্যের ভারসাম্য তাতে নষ্ট হয়। কিন্তু ট্রাম্প অর্থনৈতিক শক্তির জোরে সেই পথ অবলম্বন করছেন।

কিন্তু এ ক্ষেত্রেও ট্রাম্পের নীতির কোন যুক্তিযুক্ত ব্যাখ্যা নেই।মার্কিন প্রশাসনের অভিযোগ, ভারত সরকার তার উদ্বৃত্ত বাণিজ্য থেকে যে উপার্জন করছে সেই অর্থ দিয়ে রাশিয়ার কাছ থেকে তেল কিনে পুতিনের পকেট ভারি করছে। চীন সরকারও রাশিয়া থেকে তেল কিনছে এবং তার পরিমাণ ভারতের থেকে অনেক বেশি । অথচ চীনের ক্ষেত্রে অতিরিক্ত কোন শুল্ক এই কারণে আরোপ করা হচ্ছে না। আমেরিকার সেক্রেটারি অফ স্টেট মার্কো রুবিয়র এক্ষেত্রে যুক্তি হচ্ছে চীন, রাশিয়া থেকে তেল কেনার ফলে আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে তেলের দাম বৃদ্ধি পাচ্ছে না। ডোনাল্ড ট্রাম্প চীন রাশিয়া ফ্রান্স জার্মানি প্রভৃতি বৃহৎ শক্তিধর দেশগুলিকে ভয় পাচ্ছ। সেই কারণে চীনের উপর থেকে শুল্কের বোঝা কমিয়ে এনেছে। ভারতের মতো তুলনামূলকভাবে ক্ষুদ্র শক্তিধর দেশগুলির ওপর ট্রাম্পের হুমকি বজায় রয়েছে।

ডোনাল্ড ট্রাম্প ক্ষমতায় এসে যখন শুল্ক কে অস্ত্র হিসাবে প্রয়োগ করতে থাকে, তখন ইউরোপের অর্থনৈতিকভাবে শক্তিশালী দেশগুলিও নিশ্চুপ ছিল। প্রতিবাদী কণ্ঠস্বর ছিল একমাত্র চীন। চীন আমেরিকার আরোপিত শুল্কের সঙ্গে পাল্লা দিয়ে আমেরিকার পণ্যের উপর সমপরিমাণ শুল্ক আরোপ করেছিল। তার কারণ ছিল চীনের অর্থনৈতিক সমৃদ্ধি।

আমেরিকা অত্যাধুনিক প্রযুক্তি নির্ভর দেশ। চীন আমেরিকার উন্নত প্রযুক্তি এবং ইলেকট্রনিক শিল্পের জন্য যে পন্য (স্মার্টফোন , কম্পিউটার– integrated circuits) সরবরাহ করে তা আমেরিকার জন্য অপরিহার্য। সে কারণেই চীন শুল্কযুদ্ধের ক্ষেত্রে আমেরিকার সঙ্গে টক্কর দিতে পারে। আমেরিকার তুলনায় ভারত ক্ষুদ্র অর্থনীতি। অর্থনৈতিক বিশেষজ্ঞদের মতে ২০০৪ সালে চীন যে জায়গায় ছিল আজ ভারত সেই জায়গায় পৌঁছেছে। সেজন্য ভারত যদি আমেরিকার সঙ্গে শুল্ক যুদ্ধে নামে তাহলে ভারতের প্রভূত বিপদের সম্ভাবনা। এ কথা জানিয়েছেন মনমোহন সিং সরকারের প্ল্যানিং কমিশনের ডেপুটি চেয়ারম্যান মনটেক সিং আলুওয়ালিয়া। । এই প্রসঙ্গে তিনি বলেন মার্কিন দেশের সঙ্গে আলোচনার দরজা খোলা রাখা প্রয়োজন। আলোচনা বিভিন্ন স্তরে হতে পারে। এছাড়াও আন্তর্জাতিক বাণিজ্যে আমেরিকার অংশীদারিত্ব ১০%।

অবশিষ্ট নব্বই শতাংশের জন্য ভারত প্রতিযোগিতায় নামতে পারে। তিনি বলেন তার জন্য অবশ্য ভারতকে যথাযথ প্রস্তুতি নিতে হবে। ভারতের রপ্তানিযোগ্য পন্যের মান উন্নত করতে হবে। ভারত জাতের প্রতিযোগিতায় শক্তিশালী প্রতিপক্ষ হিসেবে অংশগ্রহণ করতে পারে।

অতিরিক্ত শুল্কর হাত থেকে রক্ষা পাওয়ার জন্য ভারতের এখন বিশেষভাবে প্রয়োজন বিভিন্ন রাষ্ট্রের সঙ্গে বাণিজ্যিক সম্পর্ক উন্নত করা। প্রাচ্যের ভিয়েতনাম, কোরিয়া প্রভৃতি রাষ্ট্র গুলির সঙ্গে বাণিজ্যিক লেনদেনের পথ প্রশস্ত করা। এছাড়াও ইউরোপিয়ান ইউনিয়ন এবং আন্তর্জাতিক যে সমস্ত বাণিজ্যিক সংস্থাগুলো আছে তাদের সঙ্গে আলোচনার ক্ষেত্র প্রস্তুত করা। CPTPPP নামাঙ্কিত যে বাণিজ্যিক সংগঠনটি আছে, তার সদস্যপদের জন্য চেষ্টা করা। জাপান, কোরিয়া , অস্ট্রেলিয়া এই সংগঠনটির সদস্য। এছাড়াও আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে বহুমুখী গোষ্ঠী গুলির সঙ্গে যোগাযোগ স্থাপন করা আবশ্যক।

আমেরিকাতে আমরা আমাদের মোট জিডিপির দুই শতাংশ রপ্তানি করি। উচ্চ হারে শুল্কের ফলে সেই রপ্তানি পরিমাণ জিডিপির এক শতাংশে নেমে যেতে পারে। রপ্তানি পরিমাণ আরো হ্রাস পাওয়ার কারণ একদিকে যেমন উচ্চহারে ডোনাল্ড ট্রাম্প আরোপিত শুল্ক অন্যদিকে ভিয়েতনাম প্রভৃত্তি দেশের উপর থেকে শুল্কের হার হ্রাস পাওয়া। জোয়ারের শুল্ক আলোকিত হবার আগে রিজার্ভ ব্যাংক অফ ইন্ডিয়া ভারতের অর্থনৈতিক সমৃদ্ধির লক্ষ্য স্থির করেছিল ৬.৫।

ভারতের উপর আমেরিকা কর্তৃক আরোপিত উচ্চ শুল্কহার এবং তার পাশাপাশি সমগ্র বিশ্বে এই শুল্ক হারের প্রভাবে, বিশ্ব বাণিজ্য সংকুচিত হয়ে পড়বে। আমেরিকার বাইরে বিশ্ববাজারে ভারতকে তার ফলে কঠিন পরীক্ষার সামনে পড়তে হবে। বিনিয়োগের পরিমাণে ও তার অভিঘাত এসে পড়বে। তার ফলে আগামী দু বছরে ভারতের সমৃদ্ধির গতি ধাক্কা খাবে।

এখনই ভারতের রপ্তানিযোগ্য পণ্য শিল্পর উপর শুল্কবৃদ্ধির অভিঘাত এসে পড়তে শুরু করেছে। ভারতের বিভিন্ন প্রান্তের শিল্পাঞ্চলগুলি অজানা আশঙ্কার প্রহর গুনছে।।

ভারতের বস্ত্র শিল্প, পিতল শিল্প ইঞ্জিনিয়ারিং পন্য সামগ্রী ডোনাল ট্রাম্প কৃত শুল্কবৃদ্ধির ফলে ব্যাপক ক্ষতির সম্মুখীন হবে। লক্ষ লক্ষ শ্রমিক কর্মহীন হয়ে পড়বে। অর্থনীতি বিপর্যস্ত হবে। উত্তর ভারতের মোরাদাবাদের পরিচয় 'পিতল নগরী' হিসেবে। বিগত প্রায় দুই শতাধী ধরে মোরাদাবাদ থেকে পিতলের তৈরি বিভিন্ন সামগ্রী আমেরিকার বাজারে রপ্তানি করা হয়ে থাকে। শাহাজানের আমল থেকে তুরস্ক ইরানসহ পশ্চিম এশিয়ার বিভিন্ন দেশে পিতলের তৈরি বিভিন্ন সামগ্রী রপ্তানি করা হয়ে আসছে। মোরাদাবাদের অনেক শিল্পপতি জানিয়েছেন যে তারা মাসে প্রায় দু কোটি টাকার পিতলের বিভিন্ন হস্তশিল্প আমেরিকাতে রপ্তানি করে থাকেন। কিন্তু এই মাশুল বৃদ্ধির ফলে ,তারা, তাদের আমেরিকার ক্লায়েন্টদের কাছ থেকে কোন সাড়া পাচ্ছেন না। অপর এক পিতল ব্যবসায়ী জানিয়েছেন যে তাদের সাড়ে পাঁচ কোটি টাকার পণ্য গুদামে পড়ে রয়েছে। এর ভবিষ্যৎ কি তারা জানেন না।

বিহারের নির্বাচনে যাদের নাম বাদ গিয়েছে তাঁরা আধার কার্ড দেখিয়ে ভোটার লিস্ট এ নাম তোলার আবেদন করতে পারবেন

যোগেন্দ্র যাদব

আজ ৩০ আগস্ট সকালে বিহারের SIR বিশেষ নিবিড় সংশোধনের ওপর গতকালের সুপ্রিম কোর্টের লিখিত অর্ডার পাওয়ার পর যোগেন্দ্র যাদবের ভিডিও বার্তা থেকে যা জানা গেল

১। BLO-রা খসড়া ভোটার লিস্টের ৭ কোটি ২৪ লক্ষ ফর্মে যে not recommended অর্থাৎ অনুমোদন করা হচ্ছে না লিখে দিয়েছিল তা গণ্য করা হবে না। অনুমান করা যাচ্ছে কমপক্ষে ১০ অর্থাৎ ৭০ লক্ষ ফর্মে এরকম মন্তব্য করেছে BLO-রা। এটা মানা হবে না।

২। যে ৬৫ লক্ষ ভোটারের নাম বাদ গেছে, তারা শুধু আধার নাম্বার দিয়ে আর্জি (claim & objection) জানাতে পারবে। নির্বাচন কমিশন চেয়েছিল যে এই বাদ যাওয়া ৬৫ লক্ষ ভোটার ৬নং ফর্ম ভরে নতুন আবেদন করুক। তার মানে হল, পুরোনো ভোটাররা এতদিবের ভোটাধিকার হারিয়ে নতুন ভোটার হওয়ার দরখাস্ত করুক। এছাড়া গত ২২ তারিখের শুনানির আগে শুধু আধার নাম্বার দিলে ফর্ম জমা নেওয়া হচ্ছিল না, ১১টা নথির একটা দিতে বাধ্য করা হচ্ছিল।

৩। ৬৫ লক্ষ বাদ যাওয়া ভোটাররা অনলাইনে আর্জি (claim & objection) জানাতে পারবে।

৪। দলগুলোর প্রতিনিধি হিসেবে BLA-রা এই কাজে হাত লাগাতে পারবে। এতদিন BLO-রা বিরোধী দলের BLA-দের ভোটারদের সহায়তা করতে দিচ্ছিল না।

১লা সেপ্টেম্বরের মধ্যে এইসব সুযোগ কতটা সাধারণ ভোটাররা নিতে পারবে বলা যায় না। বিহারে প্রায় এক কোটি ভোটার পরিযায়ী, অন্যত্র রয়েছে। মোবাইল ফোন থাকলেও অনলাইনে আবেদন করা পরিযায়ী শ্রমিকদের পক্ষে মোটেই সহজ ব্যাপার নয়। বিহারের ব্যাপক মানুষ নিরক্ষর। এখন চলছে রাজ্য জুড়ে বন্যা।

আর এইসব পরিবর্তনগুলো যদি বিহারে লাগু হয়ও, বিহারের SIR নিয়ে নির্বাচন কমিশনের মূল অর্ডার কিন্তু বদলায়নি। প্রেস বিজ্ঞপ্তির মাধ্যমে ঠেলতে ঠেলতে সামান্য বদল হচ্ছে। অতএব এই অর্ডার বাতিল হওয়া জরুরি। না হলে সারা দেশেই এইদিকে যাবে নির্বাচন কমিশন।

প্রসঙ্গত, এটাও জানা যাচ্ছে যে এর আগে ভারতের কোনো রাজ্যে SIR হয়নি। যা হয়েছে, সেটা হল IR– Intensive Revision নিবিড় সংশোধন, আর বছর বছর হয়েছে Summary Revision। ২০০৩ সালে বিহারে IR– Intensive Revision হয়েছিল। এবছর জানুয়ারি মাসেও বিহারে Summary Revision-এর ভিত্তিতে ভোটার তালিকা তৈরি করেছে এই নির্বাচন কমিশন। আজ সেটাই অস্বীকার করে নতুন করে ভোটার লিস্ট বানাতে চাইছে নির্বাচন কমিশন। এটা আগে কখনো হয়নি, চূড়ান্ত অগণতান্ত্রিক, অসাংবিধানিক।

বেসামাল বিজেপি ও ভোটার অধিকার যাত্রা

সুদীপ মৈত্র

ভোটার অধিকার যাত্রার এক সভায় নাকি একটি ভিডিও ভাইরাল হয়েছে (যদিও সেই ভিডিও দেখতে পাইনি), যেখানে মঞ্চ থেকে নাকি অশ্লীল ও ঘৃণাসূচক ভাষা ব্যবহার করা হয়;প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি ও তাঁর প্রয়াত মা, হীরাবেন মোদিকে নিয়ে। প্রায় সমস্ত সংবাদমাধ্যমে ভিডিওতে ব্যবহৃত বক্তব্য "so dirty itós not even

possible to repeat" এমনভাবে 'অত্যন্ত অপমানজনক' ও 'অত্যন্ত অশ্লীল' বলা হয়েছে। কিন্তু ঠিক কী বলা হয়েছে, তার কোনও উল্লেখ নেই। ধরে নিচ্ছি, শ-কার ব-কার খ-কার দিয়ে কিছু বলেছে কেউ।

এই প্রেক্ষিতে বিজেপি ও তাদের ল্যাংবোট মিডিয়া চিরাচরিত ঢঙে 'কী খারাপ কী খারাপ রাহুল আর এই কংগ্রেস, এখনই তোদের নাকে খত দিতে হবে' বলে সাতবাসি কেত্তন শুরু করেছে।

প্রথম কথা হল, বিজেপি যখনই রাজনৈতিক বিতর্কে কোণঠাসা হয়, তখনই তারা এমন একটা সন্দেহজনক ভিডিও ক্লিপ তৈরি করে বাজারে ছেড়ে দেয়, মূলত মূল বিতর্কটা ঢেকে দিতে। এটাতে তারা কিছুটা সফলও হয়, তার কারণ, তাদের হাতেই ক্ষমতা। আর প্রতিপক্ষ কংগ্রেস বা অন্যরা অসভ্যতায় সনাতনীদের সঙ্গে পেরে ওঠে না। বর্তমান বিতর্কে এসআইআর নিয়ে রাহুল গান্ধি যেভাবে তাদের দুর্নীতি ফাঁস করে বেকায়দায় ফেলে দিয়েছেন , তা থেকে নির্বাচন কমিশনও বিজেপিকে উদ্ধার করতে পারছে না। তার সঙ্গে সাড়া জাগিয়েছে অধিকার যাত্রাও। সুতরাং বিজেপি যে এমন একটা কিছু করবেই, তা তো জানা কথাই।

দ্বিতীয়ত, তারস্বরে রাহুল গান্ধিকে ক্ষমা চাইতে হবে বলে দাবি অমিত শাহ ও তার সঙ্গীদের। কেন? রাহুল বা পরিচিত কংগ্রেস নেতা কেউ অভিযুক্ত নন। অভিযুক্তের সঙ্গে দলের যোগাযোগও ধোঁয়াশাপূর্ণ। সে কংগ্রেসের নাকি বিজেপির সদস্য, নাকি ভবঘুরে, তা স্পষ্ট নয়। সে যা-ই বলে থাক, তার সঙ্গে রাহুলের র‍্যালির কোনও সম্পর্ক নেই। যে বলেছে, দায় তার। র‍্যালির আহ্বায়কদের নয়। তাছাড়া সেই ব্যক্তির আলটপকা কোনও কথাকে কেউ সমর্থনও করেনি। তাহলে কীসের জন্য ক্ষমা?

তৃতীয়ত, ব্যাপারটা যে বিজেপির চক্রান্তের অংশ নয়, সে ব্যাপারে নিশ্চিত হওয়া যায় কি? কারণ, অন্যদের সম্পর্কে সবচেয়ে বিদ্বেষপূর্ণ, অপমানজনক মন্তব্য করার বিশ্বরেকর্ড তো বিজেপি-রই। একইসঙ্গে অন্যের মন্তব্যের আগামুড়ো ছেঁটে বিকৃত করে তা অপপ্রচারের কাজে লাগানোর টেকনোলজিতেও বিজেপি অলিম্পিক চ্যাম্পিয়ন। এখানেও যে তেমন কিছু ঘটেনি, তার গ্যারান্টি কে দেবে? অযোধ্যা, গুজরাট, মণিপুর ভুলে যান। জেএনইউ, জামিয়া মিলিয়া, দিল্লি বিশ্ববিদ্যালয়ের আর এক অমিত মালস্য মাল-জি নিউজের কিত্তি তো আমাদের ভুলে গেলে চলবে না।

চতুর্থত, 'আপত্তিকর কথা' বলার পর 'ক্ষমা'র প্রসঙ্গ উঠলে, বিজেপি নেতানেত্রীদের কী হাল হবে, ভাবুন! তারা প্রতিদিন এত ঘৃণা আর বিদ্বেষ ছড়ায়, যে নাকে খত দিতে দিতে তাদের আর হয়তো হাঁটু সোজা করে দাঁড়ানোই সম্ভব হবে না!

আসলে রাহুল গান্ধির এসআইআর ভাষণ এবং অধিকার যাত্রার ধাক্কায় বিজেপি বেসামাল। তুনীরে একটাও তির নেই। তাই কাদার তালই তাদের একমাত্র অস্ত্র। তাই এই অলীককুনাট্যরঙ্গ।

গোলাম মণ্ডলের দুই শিশু সন্তান এখন কোথায় যাবে?

প্রসেনজিৎ দত্ত

ভিন রাজ্যে বাংলা বললেই বাংলাদেশী।মুসলিম হলে তো কথাই নেই,ভারতীয় নাগরিকের যতই তথ্য প্রমাণ থাকুক,হয়রানি হতেই হবে।বর্তমানে বিজেপি শাসিত রাজ্যে এরকম ঘটনা ঘটছে আকছার।

এই রাজ্যে কাজ নেই,পরিযায়ী শ্রমিক হয়ে ভিন রাজ্যে পাড়ি দিচ্ছেন পশ্চিমবঙ্গের হাজার হাজার মানুষ। এমনই একজন পরিযায়ী শ্রমিক গোলাম রহমান মন্ডল।বাড়ী উত্তর ২৪ পরগনার হাবড়া থানার পৃথিবা পঞ্চায়েতের অন্তর্গত আনোয়ারবেড়িয়া গ্রামে।

দশ বছরেরও বেশী সময় ধরে রুটি রুজির কারণে ছিলেন মহারাষ্ট্রে।থাকতেন পরিবার নিয়ে।স্ত্রী ,এক পুত্র ও এক কন্যা নিয়ে পরিবার।

গত সাত মাস আগে গোলাম হারিয়েছিলেন তাঁর স্ত্রী কে।মা হারানো দুই সন্তান এবং দারিদ্রতা , পরিস্থিতি প্রতিকুল হলেও পেটের তাগিদে পড়ে ছিলেন নিজের বাড়ী ত্যাগ করে মহারাষ্ট্রে। ভুগছিলেন ডায়াবেটিসে।

হঠাৎ করেই মহারাষ্ট্র পুলিশ হানা দিলো গোলামের আস্তানায়।অপরাধ ,তার ভাষা বাংলা ও ধর্মে মুসলিম। মুসলিম মানুষ বাংলা বলছে, নির্ঘাত বাংলাদেশী। তুলে নিয়ে যাওয়া হলো থানায়। পুলিশ হেফাজতে চার দিন,অভিযোগ খেতে না দেওয়ার। সমস্ত কাগজ পত্র দেখিয়ে অবশেষে ছাড়া পাওয়া। মানসিক ও শারীরিক অত্যাচারে পর্যুদস্ত গোলাম অসুস্থ অবস্থায় ফিরে এলেন এই বাংলায় ,নিজের বাড়িতে।কলকাতার প্রেস ক্লাবে বসে সাংবাদিকদের কাছে তুলে ধরলেন তাঁর অসহনীয় অভিজ্ঞতার কথা।

বাড়ী ফিরে ডায়াবেটিসে আক্রান্ত গোলাম আরও অসুস্থ হলেন।ভর্তি করা হলো হাবড়া হাসপাতালে।সেখানে শরীরের কোনো উন্নতি না হওয়ায় বারাসাত জেলা হাসপাতালে তাঁকে স্থানান্তরিত করা হয়।

গত ২৪ আগস্ট বারাসাত হাসপাতালেই বছর চল্লিশের গোলাম রহমান মন্ডলের জীবনাবসান হয়। তাঁর মৃত্যুতে অনিশ্চিত ভবিষ্যতে পিতা হারা দুই নাবালক - নাবালিকা সন্তান। রাজ্য সরকার কিছু অর্থ সাহায্য করলেও তাদের ভবিষ্যত আজ অন্ধকারেই নিমজ্জিত।

এই মৃত্যু আমাদের সামনে অনেক প্রশ্ন তুলে দিয়ে গেলো।

ভারত বর্ষের মতো একটা ধর্মনিরপেক্ষ রাষ্ট্রে ধর্মীয় সংখ্যা লঘুরা ক্রমশ কোণঠাসা হচ্ছে,এবং সেটা হচ্ছে এই দেশ চালাচ্ছে যে শাসক দল,তাদের পক্ষ থেকেই। সংবিধান আজ সংকটে। রক্ষা করবে কে?

পরিবেশ

ইভি কি 'পরিবেশ পদচিহ্ন' কমাতে পারবে?

রাহুল রায়

শিরোনামের বিষয়ে সরাসরি বলতে হয় যে, যানদূষণ রোধে এক উল্লেখযোগ্য অগ্রগতি ইলেকট্রিক ভেহিকল (ইভি)-এর প্রচলন। মূলত তিনটি কারণে ইভি-র প্রয়োজন আছে। প্রথমত, পৃথিবীজুড়ে পরিবহন ব্যবস্থায় প্রচুর জীবাশ্ম-জ্বালানি পুড়ে পৃথিবীর মোট বার্ষিক কার্বনডাইঅক্সাইড নিঃসরণের ১৫ শতাংশ নির্গত হয়।১ বিপরীতে ইভি সৌর এবং বায়ুর মতো নবীকরণযোগ্য শক্তিকেন্দ্র-উৎপাদিত বিদ্যুতে চলবে। জীবাশ্ম-জ্বালানি ব্যবহৃত না হওয়ায় ইভি 'শূন্য নির্গমন' যানবাহন। এগুলি রিচার্জেবল ব্যাটারিতে সঞ্চিত বিদ্যুতে চলে। দ্বিতীয়ত, জীবাশ্ম-জ্বালানি সরিয়ে 'শূন্য নির্গমন' যানবাহন পথে যত বেশি চলবে, আমাদের দেশের শহরগুলিতে তত স্থানীয় বায়ুদূষণ কম হবে। তৃতীয়ত, জীবাশ্ম-জ্বালানির ব্যবহার যত কম হবে, বিদেশী মুদ্রার বিনিময়ে তত সাশ্রয় হবে।

ইভি, ভারত ও ন্যাশনাল ক্লিন এয়ার প্ল্যান (এনসিএপি)

২০১৯ সালে 'নীতি আয়োগ' ঘোষণা করে যে, ২০৩০ সালের মধ্যে ভারতের সকল নতুন বাণিজ্যিক গাড়ির ৭০ শতাংশ, ব্যক্তিগত গাড়ির ৩০ শতাংশ, সমস্ত বাসের ৪০ শতাংশ এবং সকল দু-চাকা ও তিন-চাকা গাড়ির ৮০ শতাংশই ইভি হবে। কিন্তু ২০২৫-এর মাঝামাঝি পেরিয়েও আমরা এই লক্ষ্য থেকে দূরে রয়েছি। একমাত্র তিন-চাকা গাড়িগুলির নতুন যে নথিভুক্তি (রেজিস্ট্রেশন) হচ্ছে, তার ৬০ শতাংশ ইভি। বিশিষ্ট পরিবেশকর্মী সুনীতা নারায়ণ জানাচ্ছেন, এগুলির বেশির ভাগ স্থানীয়ভাবে তৈরি, কোন ব্র্যান্ডেড কোম্পানির নয়। আর বাকি যানবাহনের নতুন নথিভুক্ত গাড়ি, দু-চাকার গাড়ি এবং বাস-এর মাত্র ৫-৬ শতাংশ ইভি।২ কিন্তু এভাবে চললে তা না পারবে কার্বনডাইঅক্সাইড নির্গমন কমিয়ে দূষণ কমাতে, বা জীবাশ্ম জ্বালানির আমদানি-নির্ভরতা কমাতে। ভারতের যে সব শহরে বায়ুদূষণ অত্যন্ত বেশি, সেখানে দূষণ মোকাবিলায় এনসিএপি দুটি লক্ষ্য হাতে নিয়েছে; এক, 'শূন্য নির্গমন' নির্মল যানবাহন চালু করা এবং দুই, যানবাহনের সংখ্যাও কমানো। রাস্তায় কত সংখ্যক ইভি চলাচল করছে, কেবল তার হিসেব কষাই নয়, গণপরিবহন ব্যবস্থাকে ব্যাপকভাবে ছড়িয়ে দেবার কথাও এনসিএপি বলেছে। এতে যানদূষণের পরিমাণ আরও কমবে।

ব্যক্তিগত ইভি

ইভি কর্মসূচির প্রধান উদ্দেশ্যটি হল জীবাশ্ম-জ্বালানিচালিত গাড়ির 'অভ্যন্তরীণ দহন ইঞ্জিন' (ইন্টার্নাল কম্বাশন ইঞ্জিন বা আইসিই) পুরোপুরি বদলে দেওয়া, যাতে বাতাসে গ্রিনহাউস গ্যাস মেশা অনেক কমানো যায়। সুনীতা নারায়ণ জানিয়েছেন, ইওরোপে সমস্ত নতুন গাড়ির ৮০ শতাংশ ২০৩০ সালের মধ্যে যাতে শূন্য-নির্গমন গাড়ি হয়, সে-বিষয়ে এক আদেশ জারি হয়েছে। আদেশে ২০৩৫ সালের মধ্যে ১০০ শতাংশ গাড়িকেই শূন্য-নির্গমন হওয়ার কথা বলা আছে। আমেরিকার পূর্বতন প্রেসিডেন্ট জো বাইডেন-এর আমলে ২০৩০ সালের মধ্যে নতুন নথিভুক্ত গাড়ির ৫০ শতাংশ যাতে ইভি হয়, সে ব্যাপারে এক লক্ষ্যমাত্রা হাতে নেওয়া হয়েছিল। এ সব দেশে ইভি ব্যবহারের মূল উদ্দেশ্য হল পরিবহন ব্যবস্থায় কার্বন নিঃসরণ কমানো (ডিকার্বনাইজ)। আর এই ডিকার্বনাইজ করতে প্রথমেই প্রয়োজন আইসিই-র খোলনলচে ঢেলে সাজানো।৩

বিগত তিন দশকে ইওরোপে পরিবহন ব্যবস্থায় কার্বন নিঃসরণ-এর ৬০ শতাংশ ঘটেছে ব্যক্তিগত গাড়ি থেকে।৪ তাই এই ক্ষেত্রটিকে ডিকার্বনাইজ করা প্রধান লক্ষ্য ছিল। এখানে বলার, বর্তমানে ইভি-র জোগান নিয়ে ইওরোপ ভূরাজনৈতিক কারণে চিন-এর থেকে সরাসরি কিছু বাধার মুখোমুখি হচ্ছে। কারণ চিন চাইছে আগামী দিনে ইভি-র রোডম্যাপটি তৈরি করতে। ইওরোপীয় দেশগুলির সামনে এখন দুটি পথ রয়েছে। এক, ব্যক্তিগত গাড়ির মালিকদের ইভি-তে রূপান্তরের (ট্রানজিশন) জন্য ভর্তুকি দেওয়া। দুই, খুবই ভাল হয়, যদি এই ভর্তুকির টাকা দিয়ে গোটা পরিবহন ব্যবস্থাকে ডিকার্বনাইজ করা যায় এবং মানুষকে ব্যক্তিগত গাড়ি থেকে গণপরিবহনে অভ্যস্ত করে তোলা যায়। আর যদি কোন ধনী দেশ একই সঙ্গে দুটিই করতে পারে, তাহলে তো সোনায় সোহাগা।

আমাদের কী হবে?

আর এখানেই যে প্রশ্নটি খুবই সংগত কারণে ওঠে যে, আমাদের মত তিসরি দুনিয়ার গরিব দেশগুলির কী হবে? আমাদের তো একসাথে উপরিউক্ত দুটি ক্ষেত্রে ভর্তুকি দেবার ক্ষমতা নেই। এমনিতেই আমাদের দেশের ব্যক্তিগত গাড়িগুলি সরকারি ভর্তুকি-প্রাপ্ত পেট্রল বা ডিজেল-এ চলে, যা জাতীয় কোষাগারে এক বিশাল বোঝা চাপায়। অথচ এই ভর্তুকি খুব একটা দৃশ্যমান বা আলোচিত বিষয় নয়। সুনীতা নারায়ণ জানাচ্ছেন, বর্তমানে ভারতের রাস্তার প্রায় ৯০ শতাংশ বা তার বেশি স্থানজুড়ে (রোড স্পেস) ব্যক্তিগত গাড়ি চলাচল করে।৫এই সব ব্যক্তিগত গাড়ি চলাচলের জন্য সরকারকে রাস্তা তৈরি করতে হয়। যানজট কাটাতে ফ্লাইওভার গড়তে হয়। সামগ্রিকভাবে ব্যক্তিগত গাড়ির পিছনে ভর্তুকির পরিমাণ বাড়তেই থাকে।

তাই আমাদের ডিকার্বনাইজেশন এবং বায়ুদূষণ কমানোর প্রথম লক্ষ্যটি হবে অবশ্যই ব্যক্তিগত পরিবহনের ধরনগুলিকে (মোড) কমানো। ক্রমশ এক নির্দিষ্ট সময়সীমার মধ্যে এক বিপুল সংখ্যক গাড়িকে আইসিই-বিহীন শূন্য-নির্গমন গাড়িতে বদলে ফেলতেই হবে। বর্তমানে আমাদের দেশে বেশ কিছু ধনী মানুষ তাদের

পেট্রল/ডিজেল-চালিত গাড়িগুলিকে জিম্মায় রেখেই আবার নতুন দামি স্মার্ট ইভি কিনছেন। এতে কিন্তু আমরা পরিবহন ক্ষেত্রে যে বদল চাইছি, তা হবে না।

ভারত সরকার গণপরিবহন, যেমন; ইভি বাস বা ইভি তিন-চাকার গাড়িতে (প্যারাট্রানজিট) ভর্তুকি দেওয়ার নীতি হাতে নিয়েছে। ব্যক্তিগত ক্ষেত্রে দু-চাকার ইভি গাড়িতে ভর্তুকি দেবার কথা হয়েছে।৬ দু-চাকার গাড়ি কম রোড স্পেসজুড়ে চলে। আমরা যদি গণপরিবহনকে নির্মল করে তুলে বৃহত্তর ক্ষেত্রে ছড়িয়ে দিতে পারি, তাহলে আগামী দিনে নির্মল পরিবহন ব্যবস্থার সুফলগুলি অবশ্যই টের পাব। প্রথমেই অত্যন্ত দূষণকারী প্রতিটি ধরনের গাড়িকে (তিন-চাকা থেকে ট্যাক্সি ও বাস, লরি ইত্যাদি) নির্দিষ্ট সময়সীমা ভিত্তিক সরকারি আদেশে ইভি-তে রূপান্তরিত করা প্রয়োজন। কেবল নতুন নথিভুক্ত গাড়ির জন্যই এই আদেশ নয়, পুরানো সমস্ত রকম অতি দূষণকারী গাড়ির জন্যও এই আদেশ কার্যকর করতে হবে। আমরা যখন ব্যক্তিগত গাড়ির ব্যবহার কমিয়ে সত্যিকারের নিচু-কার্বনবিকল্পের (লো-কার্বন অপশন) দিকে, যেমন- হাঁটা, সাইকেল চড়া, ট্রাম (আশ্চর্যের হলেও সত্যি, কলকাতা শহর থেকে পশ্চিমবঙ্গ সরকার পরিবেশ-বান্ধব ট্রাম তুলে দেওয়ার সিদ্ধান্ত নিয়েছে) বা মেট্রো ব্যবহারের দিকে ঝুঁকব, তখনই জলবায়ু পরিবর্তন রোখার লক্ষ্যগুলি পূরণ করতে পারব।

ইভি-র পরিবেশীয় পদচিহ্ন

বায়ুমণ্ডলে গ্রিনহাউস গ্যাসের নিঃসরণ কমাতে এবং শহুরে বায়ুর গুণমান উন্নত করতে বিশ্বজুড়ে ইভি-র প্রচলন হলেও এর উৎপাদন, কার্যপ্রণালী এবং জীবনচক্র শেষের দশার ভিত্তিতে ইভি-র সামগ্রিক পরিবেশ পদচিহ্ন মাপা দরকার। ইভি লিথিয়াম-আয়ন ব্যাটারিতে চলে। প্রচলিত আইসিই গাড়ি তৈরির তুলনায় ইভি-র ব্যাটারি তৈরিতে উল্লেখযোগ্যভাবে বেশি গ্রিনহাউস গ্যাস নির্গমন হয়। গাড়ি উৎপাদন পদ্ধতির নৈপুণ্য এবং কারখানায় শক্তির উৎস কী, এর নিরিখে একটি ৮০ কিলোওয়াটঘণ্টা লিথিয়াম-আয়ন ব্যাটারি তৈরি করতে বাতাসে ২.৫ থেকে ১৬ টন কার্বনডাইঅক্সাইড মেশে। ইভি-র ব্যাটারি তৈরিতে যে সব খনিজ লাগে, যেমন- লিথিয়াম, কোবাল্ট, নিকেল এবং ম্যাঙ্গানিজ; প্রতিটি নিষ্কাশনের নিজস্ব পরিবেশ মূল্য আছে। এক টন লিথিয়াম নিষ্কাশনে প্রায় ৫ লক্ষ গ্যালন জল লাগে, যা শুখা অঞ্চলে স্থানীয় জলসংকট বাড়িয়ে তোলে।৭কঙ্গো দেশে কোবাল্ট নিষ্কাশন করতে বিস্তীর্ণ অঞ্চলের বনভূমি কাটা পড়ে, মাটি ক্ষয় হয়, স্থানীয় জলদূষণ ঘটে।

ফলে ভয়ানক সামাজিক অস্থিরতা দেখা দেয়। ৮ইভি-র ব্যাটারি সমাবেশ-এর (অ্যাসেম্বলি) শক্তি-নিবিড় প্রকৃতি কার্বন ঋণ (কার্বন ডেট) বাড়িয়ে তোলে।৯বর্তমানেইভি-র লিথিয়াম-আয়ন ব্যাটারির খনিজ সম্পদ-নিবিড়তা কমাতে সোডিয়াম-আয়ন এবং সলিড স্টেট ব্যাটারি তৈরির কাজ চলছে। বিশ্বের বৃহত্তম ব্যাটারি উৎপাদক কোম্পানি সিএটিএল বাজারে লিথিয়াম-আয়নব্যাটারিরতুলনায় বেশ সস্তায় (কিলোওয়াটঘণ্টা পিছু ১০ ডলার কম)সোডিয়াম-আয়ন ব্যাটারি নিয়ে এসেছে।১০এতে ইভি-র দামও কমবে।

ইভি-র আয়ু গড়পড়তাবছর দশেক। গাড়ির আয়ু-শেষে এর ব্যাটারি বর্জ্যগুলির যথাযথ ব্যবস্থাপনা না হলে কিন্তু সেখান থেকে ভয়ানক দূষণ ছড়াবে। ইভি-র ব্যাটারিগুলি পুনর্ব্যবহারযোগ্য করার প্রক্রিয়াটি যথেষ্ট শক্তিনিবিড়। এই প্রক্রিয়ায় প্লাস্টিক, আঠা এবং ভারী ধাতুর মতো প্রচুর অ-পুনরাবর্তনযোগ্য বর্জ্য সৃষ্টি হয়। বেশ কিছু ব্যাটারির পুনরাবর্তন হয় না। লিথিয়াম-আয়ন ব্যাটারির নিষ্পত্তি এবং পুনর্ব্যবহার, পরিবেশগত চ্যালেঞ্জ এবং সুযোগসুবিধা -- দুটোই সৃষ্টি করে। নিষ্পত্তি না হওয়া ব্যাটারি-বর্জ্য থেকে বিষাক্ত ভারী ধাতু ও রাসায়নিক বেরিয়ে মাটি এবং জলে মিশে ভয়াবহ দূষণ ঘটাতে পারে। কিছু ক্ষেত্রে নষ্ট বা ভাঙা ব্যাটারি (ই-বর্জ্য) দিয়ে জমি ভরাটওচলে। ব্যাটারিগুলি পোড়ালে বাতাসে প্রচুর গ্রিনহাউস গ্যাস মেশে। আবার, কার্যকরভাবে এর পুনরাবর্তন হলে কোবাল্ট এবং লিথিয়ামের মতো মূল্যবান ধাতুর ৯০ শতাংশেরও বেশি পুনরুদ্ধার করা সম্ভব। তাই নিরাপদ সমাধান হল, স্বল্প-চাহিদার কাজকর্মের জন্য এসব ব্যাটারিকে আবার ব্যবহার করা, যেমন- পুরানো ব্যাটারিগুলিকে পাওয়ার গ্রিডে ব্যাকআপ বিদ্যুৎ সরবরাহ করার জন্য ব্যবহার করা, বা উদ্বৃত্ত সৌর-শক্তিকে ধরে রাখার জন্য এনার্জি স্টোরেজ ইউনিট হিসাবে ব্যবহার করা।

ইভি চলার সময়ে এর টেলপাইপ দিয়ে কোন গ্যাস বেরোয় না। ফলে বাতাসে নাইট্রোজেন অক্সাইড, পিএম ২.৫ এবং কার্বনডাইঅক্সাইড গ্যাস মেশে না।ইভি-র ব্যাটারি চার্জ করার বৈদ্যুতিক ব্যবস্থাটি কতটা কার্বন-নিবিড়, তার ওপর এর পরিবেশীয় সুবিধাগুলি নির্ভর করে। যে সমস্ত গ্রিড-এ বিদ্যুতের জোগানের এক বড় অংশ নবীকরণযোগ্য উৎস থেকে আসে, সেখানে ইভি-র ব্যাটারি চার্জ করলে কিলোমিটার পিছু মাত্র ৫০ গ্রাম কার্বনডাইঅক্সাইড গ্যাস বাতাসে মেশে। পেট্রল-চালিত এবং ডিজেল-চালিত গাড়িতে কার্বনডাইঅক্সাইড মেশার এই পরিমাণটি যথাক্রমে ১৬৫ গ্রাম/কিলোমিটার এবং ১৭০ গ্রাম/কিলোমিটার।

এভাবে একটি ইভি একই ধরনের পেট্রল-চালিত গাড়ির তুলনায় বছরে প্রায় ১৫ লক্ষ গ্রামকম কার্বনডাইঅক্সাইড বাতাসে নির্গমন করে (লন্ডন ও বার্সিলোনা-র মধ্যে চারবার বিমানে যাতায়াত করলে সমপরিমাণ কার্বনডাইঅক্সাইড বাতাসে মেশে)।১১যে সব চার্জিং কেন্দ্রে বা অঞ্চলে বিদ্যুৎ মূলত কয়লা বা প্রাকৃতিক গ্যাস থেকে আসে, সেখানে ব্যাটারি চার্জ করলে ইভি-র জীবনচক্রের শূন্য-নির্গমনের সুবিধাগুলি কমে যায়। বিপরীতে বায়ু, সৌর বা জলবিদ্যুতের মতো নবীকরণযোগ্য শক্তি-চালিত গ্রিডগুলি ইভি-র জলবায়ুজনিত সুবিধাগুলিকে সর্বাধিক করে তোলে। তাই সম্পূর্ণ শূন্য-নির্গমন এর সুবিধা পেতে গ্রিড ডিকার্বনাইজেশন অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ।

প্রসঙ্গত উল্লেখ করা যায়, বৈদ্যুতিক ট্রেনগুলি সঞ্চিত শক্তির প্রায় ৫৯-৬২ শতাংশ গতিশক্তিতে রূপান্তরিত করে। পেট্রল-চালিত আইসিই যানবাহনগুলি জ্বালানি শক্তির মাত্র ১৭-২১ শতাংশ গতিশক্তিতে রূপান্তরিত করে।১২সাধারণত এ সব যানবাহনেউত্তাপ ও ঘর্ষণে জ্বালানি শক্তির ৭৫-৮৪ শতাংশ নষ্ট হয়। বিপরীতে ইভি-র ব্যাটারি শক্তির মাত্র ৩১-৩৫ শতাংশ খরচ হয় গতিশক্তিতে রূপান্তরের সময়ে।১৩শক্তি রূপান্তরের উচ্চ ক্ষমতা সামগ্রিক শক্তিচাহিদা কমায়। ইভি-র নীরব বৈদ্যুতিক মোটর শধদূষণও কমায়, যা শহুরে কোলাহলে স্বস্তি আনে।

ইভি-র অন্য সমস্যা

১৭টি রেয়ার আর্থউপাদানের অ্যালয় থেকে তৈরি রেয়ার আর্থ ম্যাগনেট ইভি-শিল্পের অন্যতম প্রধানউপাদান। বর্তমানে পৃথিবীতে উৎপাদিত রেয়ার আর্থ ম্যাগনেট-এর ৯০ শতাংশই চিন-এ তৈরি। ডোনাল্ড ট্রাম্প-এর চিন-এর ওপর বর্ধিত হারে শুল্ক চাপানোর বদলা হিসেবেআবিশ্ব সামারিয়াম, গ্যাডোলিনিয়াম, টারবিয়াম, লিউটোনিয়াম, টিট্রিয়াম ইত্যাদির মতো বেশকিছু রেয়ার আর্থ উপাদান এবং তা-দিয়ে তৈরি রেয়ার আর্থ ম্যাগনেট রপ্তানিতে চিন কড়াকড়িশুরু করেছে। ইভি-র ব্যাটারির মোটরের কয়েল ঘোরানোর ম্যাগনেট বানাতে রেয়ারআর্থ ম্যাগনেট অপরিহার্য। ইভি-র অটোমেটিক ট্রান্সমিশন বা পাওয়ার স্টিয়ারিং সিস্টেমকার্যকর করতেও রেয়ার আর্থ ম্যাগনেট আবশ্যিক। প্রতিটি ইভি তৈরিতে গড়ে যেখানে৩-৫ কিলোগ্রাম এই ম্যাগনেট লাগে, সেখানে জীবাশ্ম জ্বালানি-চালিত গাড়িতে মাত্র ১০০ গ্রামমতো রেয়ার আর্থ ম্যাগনেট লাগে। তাই চিন-এর এই ম্যাগনেট রপ্তানির ওপর কড়াকড়িতে ইভি-শিল্পধাক্কা খাবে।পৃথিবীতে ভারত রেয়ার আর্থ সঞ্চয়ের পরিমাণে তৃতীয় স্থানাধিকারী (৬.৯ মিলিয়ন টন) হলেও প্রথম চিন (৪৪ মিলিয়ন টন) এবং দ্বিতীয় ব্রাজিল-এর (২১ মিলিয়নটন) থেকে অনেকটাই পিছিয়ে।১৪

জীবাশ্মজ্বালানি-চালিত গাড়ির তুলনায় ইভি-র প্রযুক্তি আলাদা। পাড়ায় বা রাস্তার ধারের গ্যারাজের মিস্ত্রিরা ইভি-র যান্ত্রিক গোলযোগ সারানোরপদ্ধতি এখনও জানেন না। এতে ইভি হঠাৎ খারাপ হলে মালিকরা রাস্তাঘাটে সমস্যায় পড়ছেন। তখনএকমাত্র ভরসা অথোরাইজড সার্ভিস সেন্টার , যা হাতের কাছে অমিল। এ সমস্যা দূর করতে গ্যারাজকর্মি/মিস্ত্রিদের দাবি মেনে আমাদের রাজ্য সরকারের কারিগরি শিক্ষা দপ্তর এবং শ্রম দপ্তরেরসহযোগিতায় এঁদের প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা চালু হতে চলেছে। 'মোটর ভেহিকেল অ্যাক্ট'-এ এখনও ইভি সংক্রান্ত আইনের স্পষ্ট উল্লেখ নেই। এইঅ্যাক্ট-এর সংশোধন জরুরি, যাতে ইভি একটি আইনি নিয়ন্ত্রক কাঠামোয় থাকে। এতে কোন দুর্ঘটনা ঘটলে দোষীদের দায়ী করা যাবে এবং ক্ষতিগ্রস্ত মানুষ ক্ষতিপূরণ পাবেন।

অতঃকিম্

স্বল্প-দূরত্বে গাড়ির পরিবর্তে হাঁটা বা সাইকেল,দীর্ঘ-দূরত্বের জন্য পুল-কার বা গণপরিবহনে যাতায়াত, নিজের গাড়ি থাকলে তা ঠিকমতো রক্ষণাবেক্ষণ ও মেরামত করাযানদূষণ কমাতে সাহায্য করে। যত দীর্ঘ সময় ধরেআমরা জীবাশ্ম-জ্বালানি-চালিত যানবাহন ব্যবহার করব, বাতাসে তত বেশি কার্বনডাইঅক্সাইডগ্যাসমিশবে। গাড়ির সংখ্যা বাড়লেযানজটও বাড়বে। ভারতের রাস্তায়নথিভুক্ত প্রায় ২৬ কোটি দু-চাকার গাড়ি এবং৫ কোটি চার-চাকারগাড়ি চলাচল করে।যদি সমস্ত রকম চার-চাকার গাড়ি, যেমন-কার,জিপ, ট্যাক্সি ইত্যাদিকে এই হিসেবের মধ্যে আনা যায়, তাহলে সংখ্যাটি দাঁড়াবেসাত কোটিরওবেশি। ভারতেপ্রতি ১০০০ জনে ১৮৫টি দু-চাকার গাড়ি এবং ৩৪টিচার-চাকার গাড়ি রয়েছে।১৫ সুনীতানারায়ণ জানাচ্ছেন, ভারতে গড়ে রোজ প্রায় ১০,০০০ ব্যক্তিগত গাড়ি রাস্তায় যোগ হয়।১৬ এতেগাড়ির গতি কমে যানজট সৃষ্টি হয় যা তিন-চার লেন-এর রাস্তাবিন্যাস এবং উড়ালপুলও সামলাতে হিমশিম। যানজটের পরিণতি স্থানীয় বায়ুদূষণ। তাই এনসিএপি-র গৃহীত দুটি লক্ষ্যপূরণ আশু প্রয়োজন।

সম্প্রতিএক সর্বভারতীয় সংবাদ মাধ্যমের ওয়ার্ল্ড লিডারস্ ফোরাম-এভারতের প্রধানমন্ত্রীবিশ্বের ১০০-র বেশি দেশে ভারতে তৈরি ইভি রপ্তানির পরিকল্পনার কথা জানিয়েছেন। দেশের অর্থনীতি সচল রাখার জন্য হয়তো এর প্রয়োজন রয়েছে, কিন্তু একইসঙ্গে এর পরিবেশ পদচিহ্নের কথাটিওমাথায় রাখা প্রয়োজন।১৭নটে গাছটি মোড়ানোর আগে না বললেই নয়, জনসংখ্যা নিয়ন্ত্রণ এবং আমাদের ভোগবাদী যাপনে রাশ টানতে না পারলে বিশ্বজুড়ে যানবাহনজনিত দূষণ রোধ করাকঠিন।যত ব্যক্তিগত ইভি-ই রাস্তায় নামুক না কেন, ইভি-র ব্যাটারি তৈরি ও তার নিষ্পত্তি সংক্রান্ত নানান পরিবেশ পদচিহ্ন ও সমস্যা আমরা ওপরের আলোচনায় জেনেছি।তাই ইভি-র টেলপাইপ দিয়ে কার্বন নির্গমন না হলেও এই গাড়ির যে কোনকার্বন পদচিহ্ন নেই, তা-তো নয়। আমাদের দেশের রাস্তায় কী পরিমাণব্যক্তিগত গাড়ি, প্যারাট্রানজিট এবং গণপরিবহন চলাচল করে, তার হিসেব মেলে। দেশের সামরিক বিভাগে প্রচুর গাড়ি লাগে অসামরিক ও সামরিক কাজে। এদের সংখ্যা কত, এই গাড়িগুলির কয়টি জীবাশ্ম-জ্বালানি চালিত বা ব্যাটারি-চালিত, সেসব তথ্য মেলা ভার।

রাষ্ট্রপুঞ্জের জেনিভা অ্যাকাডেমির তথ্য অনুযায়ী এই মুহূর্তে বিশ্বজুড়ে ১১০টিরও বেশি সশস্ত্র লড়াই জারি আছে। সেখানে সামরিক বাহিনীর সাঁজোয়া গাড়ির কার্বন নির্গমনে আবিশ্ব জলবায়ু পরিবর্তন রোখার লক্ষ্য থেকে আমরা দূরে সরে যাচ্ছি। কারণ এই সাঁজোয়া গাড়িগুলি ব্যাটারি-চালিত বলে কোন তথ্য আমাদের হাতে নেই। বিশ্বজুড়ে যুদ্ধ বন্ধ হলে এই সাঁজোয়া গাড়ির দাপাদাপিও বন্ধ হবে। রাষ্ট্রপুঞ্জকেই আন্তর্জাতিক চুক্তি সম্পাদনের মাধ্যমে এই যুদ্ধ বন্ধে এগিয়ে আসতে হবে। পেন স্টেট বিশ্ববিদ্যালয়ের রায়ান পি

থম্বস্ প্রমুখ 'প্লস ক্লাইমেট' পত্রিকায় এক গবেষণাপত্রে (০২.০৭.২৫) জানিয়েছেন, আবিশ্ব জলবায়ু সংকট এবং অন্যান্য টেকসই পরিবেশবান্ধব বিষয়ে বাধাদানে মার্কিন সামরিক বাহিনীর উল্লেখযোগ্য অবদান রয়েছে। এই বাহিনী পৃথিবীর বৃহত্তম একক প্রাতিষ্ঠানিক গ্রিনহাউস গ্যাস নির্গমনকারী হিসেবে গবেষণাপত্রে চিহ্নিত হয়েছে।১৮ এই সঙ্গেই প্রয়োজন নানান দেশজুড়ে প্রাকৃতিক সম্পদের ন্যায্য বন্টন ও তা ব্যবহারের সুযোগ। ধনী রাষ্ট্রগুলোই পৃথিবীজুড়ে একতরফা প্রাকৃতিক সম্পদের নিয়ন্ত্রকওভোক্তা হয়ে যাতে না থাকে, সে-বিষয়টিও রাষ্ট্রপুঞ্জকে নিশ্চিত করতে হবে। এতে ভোগবাদ নিয়ন্ত্রিত হবে। বাতাসে গ্রিনহাউস গ্যাসের নির্গমন কমিয়ে ভূ-উষ্ণায়ন রুখতে ইভি ভবিষ্যতে অবশ্যই নতুন সবুজ-পথের দিশা দেখাতে পারে,যদি এসব সমস্যাগুলি প্রথমেই গুরুত্ব সহকারে দূর করা যায়। নইলে সেগুলি বুমেরাং হয়ে পরিবেশেই ফিরে আসবে। (কৃতজ্ঞতা বিশ্বজিৎমুখোপাধ্যায়, সমাজওপরিবেশকর্মী)

তথ্যউৎস

১। সুনিতা নারায়ণ ইলেকট্রিক ভেহিকেলস ্হোয়াই অ্যান্ড হাও; ডাউনটুআর্থ, ১-১৫ জুন, ২০২৫।
২। ওই।
৩। সুনিতা নারায়ণ মাস্টউই প্রোমোট প্রাইভেট ইভিজ? ডাউনটুআর্থ, ১৬-৩০ জুন, ২০২৫।
৪। ওই।
৫। ওই।
৬। ওই।
৭। মার্থালরেন্স ড্রাইভিং থ্রিন দ্য এনভায়রনমেন্টাল ইমপ্যাক্টস্ অফ ইভিজ;ইডিএফ, ১৩.০১.২০২৫।
৮। আবদুল্লাহ এনভায়রনমেন্টাল ইমপ্যাক্টস্ অফ ইলেকট্রিক ভেহিকেলস্;ইভিমেকানিকা, ০৪.০৯.২০২৪।
৯। ওই।
১০। জুলিয়ান হর্সে হাও সিএটিএলমেডব্যাটারিজ নাইন্টিপার্সেন্ট চিপার ইউজিং সল্ট গুডবাই লিথিয়াম? ১৫.০৮.২০২৫, গিকি গ্যাজেটস্।
১১। মার্থালরেন্স, প্রাগুক্ত।
১২। আন্ডারস্ট্যান্ডিং দ্য ইমপ্যাক্টস্ অফ ইভিজ অনদ্য এনভায়রনমেন্ট; এসজিআই, ১০.০২.২০২৫।
১৩। মার্থালরেন্স, প্রাগুক্ত।
১৪। ইভি-ররেয়ার-আর্থ ম্যাগনেট সমস্যায় বিকল্পের খোঁজে দিল্লি; এই সময়, কলকাতা, ১২.০৬.২০২৫।
১৫। ভেহিকলওনারশিপইনইন্ডিয়া;ডেটাফর ইন্ডিয়া।
১৬। ডাউনটুআর্থ, ১-১৫ জুন, ২০২৫, প্রাগুক্ত।
১৭। এইসময়; কলকাতা, ২৫.০৮.২০২৫।
১৮। রায়ান পি থম্বস্, অ্যান্ড্রিউকেজোরগেনসন, ব্রেটক্লার্ক রিডিউসিংইউএস মিলিটারি স্পেন্ডিং কুড লিড টু সাবস্ট্যানশিয়াল ডিক্রিজেসইন এনার্জিকনজাম্পশন; প্লস ক্লাইমেট, ০২.০৭.২৫।

স্বাধীনতা সংগ্রামে রাষ্ট্রীয় স্বয়ং সেবক সঙ্ঘের ভূমিকা

শান্তনু দত্ত চৌধুরী

(প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী গত ১৫ আগস্ট স্বাধীনতা দিবস উপলক্ষ্যে লালকেল্লার দুর্গপ্রাকার থেকে এক দীর্ঘ ভাষণ দিয়েছেন । ২০৩ মিনিট ধরে এতাবত কালের দীর্ঘতম ভাষণে তাঁর প্রিয় বিষয় অনুপ্রবেশ ও জনসংখ্যার চরিত্র পরিবর্তন নিয়ে বলেছেন, বলেছেন নতুন হারে জিএসটি প্রবর্তনের কথা ইত্যাদি । কিন্তু সবচাইতে গুরুত্বপূর্ণ হল তিনি খুব গর্বের সঙ্গে বলেছেন, এই বছর রাষ্ট্রীয় স্বয়ং সেবক সংঘের জন্ম শতবর্ষ । তিনি বলেছেন এই আরএসএস পৃথিবীর বৃহত্তম এনজিও এবং এই সংগঠন সেবা ও ত্যাগের দ্বারা জাতির সেবা করে এসেছে । তিনি অবশ্য দেশের স্বাধীনতার সংগ্রামে এই সংগঠনের কি ভূমিকা ছিল সে বিষয়ে একটি বাক্যও উচ্চারণ করেন নি । আমরা জন্মের পর থেকে আরএসএস এর ভূমিকা কি ছিল সেই ইতিহাসের দিকে দৃষ্টিপাত করে দেখতে পারি । তাই এই নিবন্ধের অবতারণা।)

উগ্র জাতীয়তাবাদের প্রবক্তা রাষ্ট্রীয় স্বয়ং সেবক সঙ্ঘ (আর এস এস) ধর্মভিত্তিক জাতীয়তাবাদের প্রচারক ।ব্রাহ্মণ্যবাদী হিন্দু ধর্ম এদের ভিত্তি।১৯২৫ এ আর.এস.এস প্রতিষ্ঠিত হবার ৪০ বছর আগে ১৮৮৫ সালে ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেস প্রতিষ্ঠিত হয়। ব্রিটিশ শাসিত ভারতে শাসনতান্ত্রিক কাজে ভারতীয় জনসাধারণের অংশগ্রহণ ও নাগরিক অধিকার অর্জনের জন্য এই সংগঠন গঠিত হয় ।কংগ্রেস গঠনের আগে দেশের নানা প্রান্তে একই উদ্দেশ্যে বিভিন্ন সংগঠন গড়ে ওঠে ।যার মধ্যে অন্যতম কলকাতার ইনডিয়ান এসোসিয়েশন বা ভারত সভা। এই সব সংগঠনের মিলিত মঞ্চরূপে কংগ্রেস গঠিত হয়।

কংগ্রেস গঠনের দুই বছর আগে ১৮৮৩ সালে আর্য সমাজ ও শুদ্ধি আন্দোলনের নেতা দয়ানন্দ সরস্বতী প্রয়াত হন। তিনি শ্রমের বিভাজনই বর্ণাশ্রম প্রথার ভিত্তি বলে মনে করতেন। ফলত নিম্নবর্ণের হিন্দুরা ধর্মান্তরিত হতে পারে এই আশঙ্কাথেকে তিনিশুধ্বি আন্দোলন শুরু করেছিলেন। তিনি মূর্তিপূজার বিরোধী ছিলেন। আর্যরা ভারতেরসন্তান এই তত্ব তিনি প্রচার করেন ।তাঁর মতবাদই পরবর্তী কালে হিন্দুত্ববাদী আন্দোলনের ভিতরচনা করেছিল। যদিও তাঁর মূর্তি পূজার বিরোধিতা সনাতনপন্থী হিন্দুরা গ্রহণ করেনি।

কিন্তু কংগ্রেস সংগঠন গোড়া থেকেই হিন্দুত্ববাদী মতবাদকে পরিহার করে অগ্রসর হয়। কংগ্রেস প্রথম থেকেই ধর্মভিত্তিক জাতীয়তাবাদের পথ পরিত্যাগ করে। কংগ্রেসের অন্যতম প্রতিষ্ঠাতা সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় তাঁর The Nation in making গ্রন্থে জাতি গঠন পর্ব ও জাতীয়তাবাদের উন্মেষের প্রথম পর্বের বিবরণ দিয়েছেন। তা পাঠ করলেই এই বিষয়টি অনুধাবন করা যায়। ১৮৮৫

সালে প্রতিষ্ঠার পর সর্বসম্মতিক্রমে নির্বাচিত দলের প্রথম তিনজন সভাপতি উমেশ চন্দ্র ব্যানার্জি, দাদাভাই নৌরজি ও বদরুদ্দীন তায়েবজি ছিলেন অহিন্দু।তাতে কোনো সমস্যা হয়নি। কংগ্রেস ভারতীয় জাতিয়তাবাদের উন্মেষের প্রধান সংগঠনে পরিণত হয়। দেশেরসংখ্যাগরিষ্ঠ হিন্দু সম্প্রদায়ও বিপুল সংখ্যায় কংগ্রেসে যোগ দেয়।

১৯০৫ সালে বঙ্গ ভঙ্গ বিরোধী আন্দোলনের মধ্য দিয়ে কংগ্রেস ক্রমশঃ আন্দোলনমুখী সংগঠনে পরিণত হয়।এই সময় কংগ্রেসের মধ্যে নরমপন্থী ও চরমপন্থীদের মধ্যে আন্দোলনের পন্থা নিয়ে সংঘাত উপস্থিত হয়।চরমপন্থীদের নেতারুপে লালা লাজপত রায়, বাল গঙ্গাধর তিলক ও বিপিন চন্দ্র পাল আত্মপ্রকাশ করেন। লালা লাজপত রায় আর্য সমাজের অনুগামী ও ১৯১৫ সালে হিন্দু মহাসভা সংগঠন আত্মপ্রকাশ করলে তার অন্যতম সংগঠক ছিলেন। একদা তিনি মুসলমানদের জন্য পাঞ্জাব ও তার পশ্চিমাঞ্চলের প্রদেশ নিয়ে একটি পৃথক দেশ গঠনের কথা বলেছিলেন। কিন্তু দৃঢ়চেতা সাম্রাজ্যবাদ বিরোধী এই নেতা রুশ বিপ্লবকে সমর্থন করেন।শ্রমিক শ্রেণির প্রথম সংগঠন AITUC 'র প্রতিষ্ঠাতা সভাপতি।১৯২০ সালে কলকাতা অধিবেশনে কংগ্রেস সভাপতি হয়েছিলেন।১৯২৮ সালের নভেম্বর মাসে সাইমন কমিশন বয়কট আন্দোলনে নেতৃত্ব দেন ও লাহৌরে পুলিশের লাঠি চার্জে আহত হয়ে তাঁর মৃত্যু হয়।

বাল গঙ্গাধর তিলক মহারাষ্ট্রে শিবাজি উৎসব ও গনেশ চতুর্থী প্রচলন করেন। হিন্দু ধর্মীয় উৎসবের মাধ্যমে সাম্রাজ্যবাদ বিরোধী জাগরণ ঘটান।তাঁর 'গীতারহস্যম'-গ্রন্থে তিনি গীতার ব্যাখ্যা দিয়েছেন। কিন্তু আবার তিনিই ১৯১৬ সালে মুসলিম লিগ নেতা মহম্মদ আলি জিন্নার সংগে লখনৌ প্যাক্ট করেন।তাতে বলা হল হিন্দু সংখ্যাগরিষ্ঠ প্রদেশে আইন সভা ও চাকুরীর ক্ষেত্রে মুসলমানদের যেমন সংরক্ষণ থাকবে, তেমনই মুসলমান সংখ্যাগরিষ্ঠ প্রদেশে একইভাবে সংরক্ষণ থাকবে হিন্দুদের জন্য। তিলকের মতে দেশে এখন তিনটি নয়, দুটি পক্ষ থাকবে।এক দিকে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদ আর তার প্রতিপক্ষ ঐক্যবদ্ধ হিন্দু মুসলমানসহ ভারতীয়রা। এর ভিত্তিতে ১৯১৬ সালে শুরু হয় ' হোম রুল ' আন্দোলন।যার নেতা ছিলেন তিলক , জিন্না ও অ্যানি বেসান্ট। তিলক সম্পর্কে ব্রিটিশ সরকার বলতো ' Father of Indian unrest'. লোকমান্য তিলকের বিখ্যাত উক্তি ' (waraj is my birthright '.১৯০৮ সালে তিলক তাঁর কেশরী পত্রিকায় দুই বিপ্লবী ক্ষুদিরাম ও প্রফুল্ল চাকিকে সমর্থন করায় তাঁর বিরুদ্ধে রাজদ্রোহের (Sedition) অভিযোগ আনা হয়। বিচারে তাঁর ৬ বছর কারাদণ্ড হয়। এই বিখ্যাত মামলায় তাঁর আইনজীবী ছিলেন মহম্মদ আলি জিন্না। তিলক বার্মার মান্দালয় জেলে ৬ বছর বন্দী ছিলেন। ভি.আই.লেনিন 'ইস্ক্রা' পত্রিকায় তিলকের এই কারাদণ্ডের সমালোচনা করেন। ১৯২০ সালের ১ আগস্ট তিলক প্রয়াত হন।

ডা. বি এস মুঞ্জে

ডা.বালকৃষ্ণ শিবরাম মুঞ্জে প্রথম জীবনে তিলকের শিবাজী উৎসব ও গণেশ চতুর্থী ইত্যাদি কর্মসূচিতে অনুপ্রাণিত হয়ে কংগ্রেসে যোগ দেন। তিলকের মৃত্যুর পর তিনি কংগ্রেস ত্যাগ করেন। তিনি হিন্দু মহাসভার কাজে আত্মনিয়োগ করেন ।

গান্ধিজির ধর্ম নিরপেক্ষতা ও অহিংস অসহযোগ আন্দোলনের তিনি বিরোধিতা করেন। ১৯২১ এর অসহযোগ আন্দোলনের সঙ্গে খিলাফৎ আন্দোলনকে যুক্ত করার তিনি তীব্র সমালোচনা করেন। তিনি এই আন্দোলনে যোগ দেননি। ডা.মুঞ্জে ১৯৩১ ও ১৯৩২ এ প্রথম ও দ্বিতীয় গোল টেবিল বৈঠকে যোগ দেন ও ব্রিটিশের সহায়ক ভূমিকা পালন করেন। ১৯৩১ এ প্রথম গোল টেবিল বৈঠকে যোগ দিয়ে ফেরার পথে তিনি ইতালি যান ও নাৎসি নেতা সেনর মুসোলিনির সঙ্গে দেখা করেন। মুঞ্জে নাৎসিদের বিভিন্ন শিবির পরিদর্শন করে মুগ্ধ হন ও দেশে ফিরে তাদেরভূয়সী প্রশংসা করেন। ১৯৩৩ সালে হিন্দু মহাসভা মুঞ্জের সভাপতিত্বে দল হিসেবে আত্মপ্রকাশ করে। ১৯৩৭ সালে তিনি হিন্দু মহাসভার দায়িত্বভার বিনায়ক দামোদর সাভারকরের হাতে তুলে দেন।

ডা. হেডগেওয়াড় ও আর এস এস প্রতিষ্ঠা

ডা .কেশব বলিরাম হেডগেওয়াড় কলকাতার ন্যাশানাল মেডিক্যাল কলেজের স্নাতক। ডা.মুঞ্জে তাঁকে ডাক্তারি পড়ার জন্য প্রভূত সহায়তা করেন।ডাক্তারি পড়া শেষ করে ডা. হেডগেওয়ার ১৯১৫ সালে নাগপুরে এসে পেশাগত জীবন শুরু করেন।ইদানিং সংঘ পরিবার থেকে বলা হচ্ছে তিনি অসহযোগ আন্দোলনে যোগ দিয়ে কারাবাস করেছিলেন। কিন্তু তিনি খিলাফৎ আন্দোলনকে অসহযোগ আন্দোলনের সঙ্গে যুক্ত করার জন্য গান্ধিজির তীব্র সমালোচনা করেন। তাঁর জীবনীকার সি.পি.ভিসিকর লিখেছেন '' ডাক্তার সাহেব মনে করতেন যে অসহযোগ আন্দোলনের ফলে ' যবন সর্প ' (পড়ুন মুসলমানরা) তার বিষাক্ত ফনা বিস্তার করেছে।এই আন্দোলন সমাজ জীবনে অশুভ শক্তির জন্ম দিয়েছে। ব্রাহ্মণ ও অব্রাহ্মণদের মধ্যে দ্বন্দ্ব বৃদ্ধি করেছে ও তার নগ্ন বহিঃপ্রকাশ ঘটছে। 'মালাবার উপকূলের মোপলাদের (মুসলমান কৃষকদের) ভূস্বামীদের বিরুদ্ধে বিদ্রোহকে তিনি হিন্দুদের ওপর চরম অত্যাচার বলে বর্ণনা করেন।

১৯১৬ সালের লখনৌ চুক্তি ও ১৯২১ এর যুক্ত অসহযোগ ও খিলাফৎ আন্দোলনের ফলে অভূতপূর্ব সাম্প্রদায়িক ঐক্য গড়ে উঠেছিল।এই ঐক্য সব চাইতে বেশি শঙ্কিত করেছিল বৃটিশরাজওতাদেরসহযোগী সাম্প্রদায়িকশক্তিকে।অসহযোগ ও স্বাধীনতা সংগ্রামে হাজার হাজার নিম্নবর্ণের মানুষ যোগ দিতে থাকায় তাঁদের চেতনার মান বৃদ্ধি পেতে থাকে। একই সঙ্গে গান্ধিজির অস্পৃশ্যতার বিরুদ্ধে অভিযান রক্ষণশীল ও সাম্প্রদায়িক উচ্চবর্ণের মানুষদের বিক্ষুব্ধ করে তোলে।

১৯২৫ সালে বিজয়া দশমীর দিন ডা. মুঞ্জে, ডা. এল ভি পরাঞ্জপে, ডা.বি বি থালকার, বাবুরাও সাভারকর (বিনায়ক দামোদর সাভারকরের ভাই) ডা.হেডগেওয়াড় এই পাঁচ জন মিলে একটি হিন্দুত্ববাদী সংগঠন গড়ে তোলার সিদ্ধান্ত নেন।প্রথম চারজন ছিলেন হিন্দু মহাসভার নেতা এবং এঁরাও ইতিমধ্যে হিন্দু স্বয়ংসেবক সমিতি ও হিন্দু সংরক্ষণ সমিতি নামক শাখা সংগঠন গড়ে তুলেছিলেন। ওই দিনের সভায় উপস্থিত ব্যক্তিরা হিন্দুত্ববাদী সংগঠনগুলির দুর্বলতা নিয়ে আলোচনা করেন। তাঁরা এই সিদ্ধান্তে আসেন যে উচ্চবর্ণের হিন্দুরা কোনো সংঘর্ষ হলে নিজেদের প্রতিরক্ষা বিধান করতে সক্ষম নন।তারা নির্ভর করেন নিম্নবর্ণের হিন্দুদের ওপর। তাই উচ্চবর্ণের হিন্দু সন্তানদের শৈশবেই এই সংগঠনে অন্তর্ভুক্ত করতে হবে ও তাদের শারীর শিক্ষা ও কসরৎ শেখাতে হবে যথা লাঠি খেলা, ছোরা খেলা, বর্ষা ছোঁড়া ইত্যাদি।প্রথম থেকেই এই সংগঠন মধ্যবিত্ত ব্রাহ্মণ, বানিয়া ও অন্যান্য উচ্চবর্ণের ছেলেদের নিয়ে গড়ে ওঠে। ১৯২৬ এর বিজয়া দশমীর দিন ওই সংগঠকরা আবার মিলিত হয়ে সংগঠনের নামকরণ করেন ' রাষ্ট্রীয় স্বয়ং সেবক সংঘ ' ।

ডা. হেডগেওয়াড় ও অন্যান্যরা মনে করেন'রাষ্ট্রীয়' অর্থাৎ ' হিন্দুত্ব ' সমার্থক। সংঘ ও রাষ্ট্র ' র পতাকা হবে গৈরিক যা প্রথমে রামচন্দ্র ও পরে ছত্রপতি শিবাজী বহন করতেন। শিবাজীকে তাঁর গুরু রামদাস এই গৈরিক পতাকা দিয়েছিলেন বলে সংঘ পরিবারের সদস্যরা মনে করেন।এরা এই গৈরিক পতাকাকে ' ভাগোয়া ' ঝান্ডা বলেন।

ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদের সঙ্গে কোনো দ্বন্দ্ব নেই

আর.এস.এস এর সঙ্গে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদের যে কোনো দ্বন্দ্ব ছিলনা তা ডা.হেডগেওয়াড়ের বক্তৃতা , সংঘের ইতিহাস ও পরবর্তী সরসংঘ চালক এম.এস.গোলওয়ালকরেরলেখাপত্র পড়লেই জানা যায়। এঁরা মনে করতেন ব্রিটিশের সঙ্গে ভারতীয়দের কোনও দ্বন্দ্ব নেই, দেশে প্রধান দ্বন্দ্ব হিন্দুদের সঙ্গে মুসলমানও খ্রিস্টানদের। তাদের কর্মপদ্ধতি তারা সেইভাবেই নির্ধারণ করেছিল।লাঠি - সোটা নিয়ে যে সাম্রাজ্যবাদকে উচ্ছেদ করা যায় না তা আর.এস.এস. ভালোই বুঝতো।সংঘের পোশাক ছিল খাঁকি হাফ প্যান্ট ও সাদা হাফ শার্ট, মাথায় কালো টুপি। মিলের কাপড়।সংঘ কখনো বিলাতি বস্ত্র বয়কটের ডাক দেয়নি। চরকা ও খাদির সঙ্গে আর এস এস - এর কোনও সম্পর্কই ছিলনা। পুলিশের মতন পোশাক করা হয়েছিল জনসাধারণের মনে যুগপৎ ভয় ও সমীহ সৃষ্টির জন্য।স্থানীয় দাঙ্গা হাঙ্গামার সময় সংঘ সদস্যরা যাতে উপযুক্ত ভূমিকা পালন করতে পারে তার জন্য প্রশিক্ষণ দেওয়া হত। এখনও হয়।

১৯২৬-১৯২৭ সাল থেকেই দেশের নানা প্রান্তে মানুষ নানা পদ্ধতিতে বৃটিশ শাসনের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ জানতে থাকে।ভারতবাসীকে কতটা শাসনতান্ত্রিক অধিকার দেওয়া যায় তাই খতিয়ে দেখতে ১৯২৮ সালে সাইমন কমিশন আসে ভারতে।এই কমিশনের সকল সদস্যই ছিল শ্বেতাঙ্গ। প্রতিবাদে কংগ্রেস সাইমন কমিশন বয়কটের ডাক দেয়। সারা দেশ জুড়ে এই প্রতিবাদ আন্দোলনে হিন্দু মহাসভা ও আর এসএস যোগ দেয়নি।সংঘের ইতিহাসে অবশ্য ১৯২৭ সালে নাগপুরে সাম্প্রদায়িক দাঙ্গার সময় আর.এস.এস কীরকম বীরত্ব দেখিয়েছিল তার বর্ণনা আছে। (ক্রমশ)

জরুরি অবস্থার প্রেক্ষাপট ও সাম্প্রদায়িক দক্ষিণপন্থী প্রতিক্রিয়ার শক্তির অবস্থান

সুশান্ত দাসগুপ্ত

(পূর্বপ্রকাশিতের পর)

(৫)

সাম্রাজ্যবাদী শক্তি ও জরুরি অবস্থা

ইন্দিরা গান্ধি জরুরি অবস্থা ঘোষণা করার কারণ হিসাবে বৈদেশিক সাম্রাজ্যবাদী শক্তির হস্তক্ষেপ ও অন্তর্ঘাতের কথা সরাসরিভাবে না বললেও বিভিন্ন সময়ে তিনি এ বিষয়ে ইঙ্গিত দিয়েছিলেন। তিনি জনসাধারণকে অবশ্য সব সময়েই খুব জোরের সঙ্গে কোনও দেশের নাম না করে এই শক্তির চক্রান্ত সম্পর্কে সতর্ক করতেন। ১৯৬৮ সাল থেকেই তিনি এই শক্তির চক্রান্ত সম্পর্কে বলতেন। ১৯৭৩ সালে এসে তাঁর এই ধারণা আরও দৃঢ় হয়। ওই বছর চিলির নির্বাচিত প্রেসিডেন্ট সালভাদর আলেন্দে নিহত হন। ওই বছর থেকে ইন্দিরা তাঁর অনেকগুলি বক্তৃতা ও সাক্ষাৎকারে বাইরের প্রভাবে বিদেশি শক্তির হস্তক্ষেপের কথা বলেছিলেন। ভারতের একটি শক্তি হিসাবে উত্থান যে পৃথিবীর বহু শক্তিশালী দেশ পছন্দ করছে না সে কথা তিনি মনে করতেন ও দৃঢ়তার সঙ্গে তা মনে করিয়ে দিতেন। সারা বিশ্বে তৃতীয় দুনিয়ার দেশগুলির ওপর নিজেদের কর্তৃত্ব চাপিয়ে দেওয়াটা যে শক্তিশালী দেশগুলির উদ্দেশ্য এবং 'শক্তিশালী ভারত' যে তার অন্তরায় এই কথাটি ইন্দিরা গান্ধি সর্বদাই বলতেন। দেশের অভ্যন্তরে অস্থিতিশীলতা সৃষ্টি করা, অর্থনৈতিক বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি করা ছিল জেপির আন্দোলনের অন্যতম উদ্দেশ্য তা তিনি একাধিকবার বলেছিলেন। ১৯৭৫-এর ১৫ আগস্ট রাতে প্রতিবেশী বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রী বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবর রহমান সপরিবারে নিহত হন। এই ঘটনা শ্রীমতী গান্ধির বিদেশি শক্তি হস্তক্ষেপের অভিযোগকে আরও প্রত্যায়িত করে।

১৯৭৮ সালে, তখন তিনি ক্ষমতায় নেই, সাংবাদিক মেরি কারাসকে দেওয়া এক সাক্ষাৎকারে শ্রীমতী গান্ধি বলেন, 'বৈদেশিক শক্তির ষড়যন্ত্র ভালভাবেই ঘটেছে। শ্রীমতী গান্ধি বলেন মনে রাখা দরকার জরুরি অবস্থা ঘোষণার কারণে এই বিশৃঙ্খল অবস্থা সৃষ্টি হয়নি। এই বিশৃঙ্খলা শুরুর চেষ্টা শুরু হয়েছে পণ্ডিত নেহরু যখন প্রধানমন্ত্রী তখন থেকে। তাঁদের বিরুদ্ধে যে আন্দোলন তা বৈদেশিক শক্তির দ্বারা পরিচালিত হয়েছিল বলে শ্রীমতী গান্ধি উল্লেখ করেন।

জরুরি অবস্থার পিছনে সোভিয়েত ইউনিয়ন জয়প্রকাশ নারায়ণ

জয়প্রকাশ নারায়ণ মনে করতেন জরুরি অবস্থা ঘোষণার পিছনে অনেক গভীর এবং দুরভিসন্ধিমূলক পরিকল্পনা ছিল। শুধুমাত্র বিরোধীদের আইন অমান্য আন্দোলনের মুখে দাঁড়িয়েই জরুরি অবস্থা ঘোষণা করা হয়নি। ২৫ জুন বিরোধীদের সমাবেশের প্রস্তাবের জন্যই ভারতের গণতন্ত্রের ওপর এই আঘাত নেমে আসেনি। জরুরি অবস্থার পরিকল্পনা ও তা কার্যকর করার বিস্তৃত পরিকল্পনা বহু আগেই রচিত হয়েছিল। এই পরিকল্পনার লক্ষ্য ছিল, জনসাধারণ যাই রায় দিক না কেন, শ্রীমতী গান্ধি, কংগ্রেসের ভিতর যারা তাকে ঘনিষ্ঠভাবে সমর্থন করে তারা ও ভারতের কমিউনিস্ট পার্টি (সিপিআই) কোনওদিন ক্ষমতা থেকে অপসারিত না হয়। তারা যেন ক্ষমতায় সর্বদাই অধিষ্ঠিত থাকে। কিন্তু এই পরিকল্পনা ছিল প্রকৃতপক্ষে আরও বিপজ্জনক ও দানবীয়। আসলে এই পরিকল্পনা কংগ্রেস ওয়ার্কিং কমিটি বা স্বরাষ্ট্র মন্ত্রক বা মন্ত্রিসভার রাজনৈতিক বিষয়ক কমিটি বা এমনকি ইনার ক্যাবিনেটেও তৈরি হয়নি। ইন্দিরার ক্ষমতা হারানোর ভয়কে কাজে লাগিয়ে অত্যন্ত গোপনে এই পরিকল্পনা কিছু লোক তৈরি করেছিল যার সবটা ইন্দিরাও জানতো না। কারা এই পরিকল্পনাকার? জয়প্রকাশ নারায়ণের মতে জরুরি অবস্থার পরিকল্পনা করেছিল ইন্দিরার অত্যন্ত আস্থাভাজন কিছু লোক যারা সোভিয়েত ইউনিয়নপন্থী। যাদের মধ্যে আবার দু-একজন সোভিয়েত দূতাবাসের সঙ্গে নিয়মিত যোগাযোগ রাখত, এদের পরিকল্পনাই ২৬ জুন, ১৯৭৫-এ জানা গেল। ইন্দিরাজি,তাঁর দলেরমধ্যে থাকা সিপিআই, কমিউনিস্টরা, এবং পর্দার আড়ালে অপেক্ষারত সোভিয়েত এজেন্টরা যে গণতান্ত্রিক ব্যবস্থা ২৫ জুন পর্যন্ত বজায় ছিল তাকে অপসারিত করে একটি কর্তৃত্ববাদী (Totalitarian) ব্যবস্থা প্রবর্তন করল। বহুদিন পর্যন্ত এই কমিউনিস্টরা যে উদ্দেশ্য নিয়ে অগ্রসর হচ্ছিল তা কাজে পরিণত হল। প্রথম পদক্ষেপ সোশ্যাল ডেমোক্র্যাসি এবং তারপর রাশিয়ার অধীনে নগ্ন কমিউনিস্ট শাসন।

কিন্তু এই গোপন পরিকল্পনা, জয়প্রকাশ নারায়ণ তাঁর 'প্রিজন ডায়েরি'তে লিখেছেন (পৃষ্ঠা-১১৪) এখানেই শেষ হবে না। তাঁর মতে একটার বদলে সেখানে দুটি পরিকল্পনা আছে। প্রথমটিতে মনে হবে ইন্দিরাজিই প্রধান এবং জরুরি অবস্থা ঘোষণা তাঁরই পরিকল্পনা। এতে তিনিই শীর্ষে, যদি মৃত্যু এসে তাঁর জীবন সমাপ্ত না করে। দ্বিতীয় পরিকল্পনাটি হচ্ছে সোভিয়েত পরিকল্পনা যা সিপিআই-এর অত্যন্ত প্রতিভাশালী মস্তিষ্ক থেকে বেরিয়েছে। এই দ্বিতীয় পরিকল্পনা ইন্দিরাজিও নাকি জানেন না।

যদিও তাঁর মধ্যে একান্ত ব্যক্তিগত সন্দেহও আছে। এমনকী কংগ্রেসের মধ্যে যারা কমিউনিস্ট এজেন্ট তারাও এই দ্বিতীয় পরিকল্পনাটি জানে না। খুব কম দু-একজন যাদের সোভিয়েত ইউনিয়ন বিশ্বাস করে তারাই এটা জানে, এদের দেখে বোঝাই যায় না যে এরা কমিউনিস্ট বা ছদ্ম কমিউনিস্ট। তারা কখনও প্রকাশ্যে সিপিআই বা সোভিয়েত সম্পর্কে কোনও সহানুভূতি দেখায়নি। কখনও কখনও এরা সোভিয়েতের সমালোচনাও করে। এই দ্বিতীয় পরিকল্পনা যখন কার্যকর হবে অনেকের মাথা ঘুরে যাবে।

জয়প্রকাশজির মতে, এমন সময় আসতে পারে (পরে লিখেছেন এমন সময় আসবে) যখন সিপিআই ও সোভিয়েত ইউনিয়ন ইন্দিরা গান্ধির সব কিছু কেড়ে নিয়ে তাকে ইতিহাসের আস্তাকুড়েতে নিক্ষেপ করবে ও নিজেদের লোককে ক্ষমতায় বসাবে। অবশ্য এসব নাও হতে পারে। তিনি লিখেছেন, হয়তো জনতা জেগে উঠবে, সামরিক বাহিনী বাধা দিতে পারে ও ক্ষমতা নিয়ে নিতে পারে। এছাড়া জেপি 'র মতে অন্য সম্ভাবনাও আছে। (ক্রমশ)

বাংলাদেশ 'মঞ্চ ৭১' কে অঙ্কুরেই খতম করার প্রচেষ্টা ইউনুস সরকারের

নিজস্ব প্রতিবেদন: বিগত এক বছর ধরে বাংলাদেশে উপদেষ্টা-সরকার ১৯৭১ সালের মুক্তিযুদ্ধকে ধারাবাহিকভাবে হেয় প্রতিপন্ন করে চলেছে। তাদের মতে '৭১ এর মুক্তিযুদ্ধ ভাইয়ে-ভাইয়ে একটু ভুল বোঝাবুঝি। তাঁরা জোরালো কণ্ঠে বলছেন, ১৯৪৭ এর ব্রিটিশ বিরোধী স্বাধীনতা সংগ্রামে জয়লাভের পর পরবর্তী ৭৭ বছরে এই উপমহাদেশে আর তেমন বড় কিছু রাজনৈতিক ঘটনা ঘটেনি। ৭৭ বছর পর যে ঘটনা ঘটেছে তা হল কোন এক 'ডিজাইন' প্রসূত আন্দোলন এবং তার ফলশ্রুতিতে বাংলাদেশে এক 'ডিজাইন্ড' সরকারের পত্তন। তাঁদের ইতিহাস বোধের এই প্রকাশ যে আসলে ছুঁচোর কেত্তন তো বোঝার মত বোধবুদ্ধি যে তাদের নেই তা নয় কিন্তু তাঁদের বোধের ইতিহাস বা ইতিহাসের বোধও 'ডিজাইন্ড'। শুধু ইতিহাস নয়, তাঁদের ভুগোলবোধ, শিক্ষার ধারা, চেতনা সবই একটি বিশেষ 'ডিজাইন' -এর অঙ্গ।

যাই হোক, তাঁদের এই 'ডিজাইন'-এ প্রমাদ গুণছেন বাংলাদেশের আপামর জনগণ। প্রবীণ মুক্তিযোদ্ধা জহিরুল ইসলাম খান পান্না, ফজলুল হক, কামাল হোসেন, লতিফ সিদ্দিকি সহ বহু প্রবীণ মুক্তিযোদ্ধা আছেন যাদের অনেকেই আওয়ামী লিগ বিরোধী অথবা প্রত্যক্ষ রাজনীতি থেকে বহু দূরে অবস্থান করেন। এঁদের অনেকেই বুঝে বা না বুঝে 'ডিজাইন্ড' আন্দোলনে যোগ দিয়েছিলেন। এখন তাঁরা বুঝতে পারছেন যে 'ভুল হয়ে গেছে বিলকুল'। '৭১ কে অস্বীকার করা, মুক্তিযুদ্ধকে অস্বীকার করা তাঁরা কিছুতেই মেনে নিতে পারছেন না। আর এই যন্ত্রণা থেকেই তাঁরা এই সেদিন ৪ আগস্ট গঠন করেছেন 'মঞ্চ ৭১'।

এই মঞ্চ ৭১-এর ডাকে গত ২৮ আগস্ট একটি ঘরোয়া সভার আয়োজন করা হয়েছিল ঢাকা রিপোর্টারস ইউনিট এর 'শফিকুল কবির মিলনায়তনে'। সরকারী অনুমতিও পাওয়া গিয়েছিল। অনুষ্ঠানের আলোচনার শিরোনাম ছিল-'আমাদের মহান স্বাধীনতা যুদ্ধ এবং বাংলাদেশের সংবিধান'। আলোচনা শুরু হয় ঢাকা বিশ্ববিদ্যালের আইন বিভাগের প্রবীণ শিক্ষক হাফিজুর রহমান কার্জনের কথা দিয়ে। তাঁর বক্তব্যের পরই হলে ঢুকে পড়ে ২০/২৫ জনের একটি দল যারা এই নতুন প্রজন্মের বাংলাদেশে 'মব' বলে খ্যাত। এই 'মব'ই এখন একাধারে বাংলাদেশের আইন, প্রশাসন, পুলিশ, আর্মি, শিক্ষা, জ্ঞান, বিবেক ও চেতনা এবং বাকি যা থাকল সেই সব-ও। 'মব' প্রবীণ স্বাধীনতা সংগ্রামীদের যথেচ্ছ গালাগালি করল, শারিরীকভাবে হেনস্তা করল, সভা পন্ড করল এবং পুলিশ ডেকে মুক্তিযোদ্ধাদের তাদের হাতে তুলে দিল। পুলিশ ১৪-১৫ জনকে তুলে নিয়ে গেল এবং পরে সন্ত্রাস দমন আইনে তাঁদের গ্রেপ্তার দেখিয়ে জেলে ভরে দিল!

১৯৭১ সালের মুক্তিযুদ্ধকে অস্বীকার করার অর্থ বাংলাদেশকেই অস্বীকার করা। সত্যি কথা বলতে কি, এই 'ডিজাইন্ড' সরকার বাংলাদেশকে অস্বীকারই করতে চায়। নিজেকেই অস্বীকার করা এই সরকারের ভয়াবহ রূপ খুব স্বচ্ছভাবেই দেখতে পাচ্ছেন বাংলাদেশের রূপকার প্রবীণ এই স্বাধীনতা সংগ্রামীরা। তাই তাঁরা তাঁদের ইস্তাহারে বলেছেন,- 'মহান মুক্তিযুদ্ধ বাঙালি জাতির জীবনে সবচেয়ে গৌরবময় আত্মত্যাগের ঘটনা। লাখো শহীদের রক্ত, মা বোনেদের সম্ভ্রম আর কোটি কোটি মানুষের মহান আত্মত্যাগের মধ্য দিয়ে অর্জিত স্বাধীনতা শুধু একটি ভুখন্ড নয়, পতাকা নয়, জাতীয় সঙ্গীত নয়, এ হল হাজার বছরের স্বপ্ন, চেতনা, আত্মমর্যাদা প্রতিষ্ঠার নিরন্তর সংগ্রামের গৌরবোজ্জ্বল অধ্যায়। কিন্তু নিদারুণ বেদনা, ক্ষোভ আর হতাশার সঙ্গে লক্ষ করছি যে মহান মুক্তিযুদ্ধের ইতিহাসকে মুছে ফেলার চক্রান্ত চলছে'

কিন্তু বাংলাদেশের এই 'ডিজাইন্ড' সরকার কেন মুক্তিযোদ্ধাদের উপর এতটা খড়্গহস্ত হচ্ছে। হচ্ছে এই কারণে যে, এই সরকারের প্রধান ইউনুস সাহেব নিজেই সাম্রাজ্যবাদের প্রত্যক্ষ দোসর, স্বাধীনতা বা মুক্তিযুদ্ধের পক্ষে তাঁর কোন আবেগ নেই। নিজের দ্বৈত নাগরিকত্ব আছে। অন্যান্য উপদেষ্টাদের এবং আমন্ত্রিত বিশেষজ্ঞদের একটা বড় অংশের ক্ষেত্রেও এই কথা প্রযোজ্য। এঁদের এন জি ও গুলি সবই সাম্রাজ্যবাদীদের টাকায় চলে। তাই দেশের স্বার্থ তাঁদের কাছে বড় নয়। এদিকে দেশের অবস্থা ভয়াবহ। কগজে-কলমে প্রশাসন বলে হয়ত কিছু আছে কিন্তু বাস্তবে সরকার বলে কিছু নেই। আসলে এই উপদেষ্টারা চান না, শক্তিশালী সরকার বলে কিছু থাকুক। দেশের আইন-শৃঙ্খলার পরিস্থিতি একদম তলানিতে। ব্যবসায়ী, শিল্পপতিরা হতাশ। শহুরে নিম্ন ও মধ্যবিত্তরা ভয়ে কাঁপছেন। গ্রামীণ মানুষের অবস্থা সবচেয়ে খারাপ। বুঝে বা না বুঝে যাঁরা 'ডিজাইন্ড' সরকার আনায় মদত দিয়েছিলেন তাঁরা একে একে সরে যাচ্ছেন নিজেদের পিঠ বাঁচাতে। এমনকি সেনাবাহিনীও বহু মতে ও ভাগে বিভক্ত। আর এই অব্যবস্থার মধ্যে জাঁকিয়ে বসেছেন পাকিস্তান আর আমেরিকার রাজনৈতিক ও ব্যবসায়িক প্রতিনিধিরা। বসে নেই চিন-ও। তাক লাগানো উন্নয়ন দেখানোর জন্য প্রধান উপদেষ্টা থেকে শুরু করে নানা রঙের রাজনীতিবিদ, আমলা, কামলাদের বারবার প্লেন ভর্তি করে নিয়ে যাচ্ছে সে দেশে। দেশে ফেরার তর সইছে না; ভ্রামণিকরা সেখানে বসেই বলে উঠছেন-'আহা কি দেখিলাম, জন্ম জন্মান্তরেও ভুলিব না'। উচ্ছ্বাস দেখে পুঁজি আর শোষনের আধুনিক নীতিমালার অন্যতম প্রবক্তা চিনা কতৃপক্ষের মুখে দেখা যাচ্ছে চওড়া হাসি। ফলে আমেরিকা আর চিনের জন্য উন্মুক্ত মৃগয়াক্ষেত্র হওয়া থেকে বাংলাদেশকে আটকাবে কে? দেশের মুক্তিযোদ্ধারা নিজেদের জীবদ্দশায় নিজেদের হাতে সৃষ্টি হওয়া নিজেদের দেশের মৃত্যুযাত্রা প্রত্যক্ষ করছেন, এর থেকে বড় রাজনৈতিক ট্রাজেডি আর কি হতে পারে!

আমাদের স্বাধীনতা কি এমনি এমনি এসেছে?

জাকির তালুকদার (সাহিত্যিক)

বড়-সড় নৌকাটির ছৈ খুলে ফেলা হয়েছে। যাতে সবাই দেখতে পায় কী ঘটছে নৌকাতে।

১২-১৪ জন সশস্ত্র রাজাকার। মাঝখানে হাত-পা বাঁধা মুক্তিযোদ্ধা মজিবর রহমান রেজা এবং গোলাম রব্বানী রঞ্জু। সারা শরীর রক্তাক্ত।

রাজাকার কমান্ডার কাসেম মাস্টার চিৎকার করে বলছে-- বল্ হারামিরা পাকিস্তান জিন্দাবাদ। কায়দে আজম জিন্দাবাদ। ইয়াহিয়া খান জিন্দাবাদ। টিক্কা খান জিন্দাবাদ।

রেজা-রঞ্জু শরীরে বেঁচে থাকা সবটুকু জোর কণ্ঠে এনে চিৎকার করছেন-- জয় বাংলা।

সঙ্গে সঙ্গে রাইফেলের কুঁদো দিয়ে অবিরাম আঘাত। মাথায়, মুখে। শরীরের যে যেখানে পারছে আঘাত করছে। রেজা-রঞ্জু আর্তনাদ করছেন। মানুষ-পশু সবাই আঘাত পেলে সহজাতভাবেই আর্তনাদ করে। তারাও করছেন। কিন্তু কোনো দয়া ভিক্ষা করছেন না।

নদীর বড় ঘাটে দাঁড়িয়ে শ খানেক মানুষ। সবার চোখে পানি। তাদের মধ্যে আমিও। সাড়ে পাঁচ বছরের শিশু তখন। চাচাতো বড়ভাই সেলিমের হাত ধরে দাঁড়িয়ে। এক পর্যায়ে এমন অত্যাচার যাতে আমাকে দেখতে না হয়, তাই সেলিম ভাই একহাত চাপা দিলেন আমার চোখে। নিজেও বেশিক্ষণ সহ্য করতে পারলেন না। কাঁদতে কাঁদতে ভাঙা গলায় বললেন-- চল বাড়িত চল।

মুক্তিযোদ্ধা রেজা-রঞ্জু গুরুদাসপুরের এক গ্রামের শেল্টারে ঘুমন্ত অবস্থায় ধরা পড়েছিলেন। এইভাবে ঘাটে ঘাটে নিয়ে গিয়ে নৌকা থামিয়ে মানুষকে দেখিয়ে অত্যাচার চালিয়েছে রাজাকার বাহিনী।

ও হ্যাঁ। শেষ পর্যন্ত তারা কোনো বুলেট খরচ করেনি। শারীরিক অত্যাচার চালিয়েই হত্যা করেছে নাটোর নবাব সিরাজ দৌলা কলেজ ছাত্র সংসদের ভিপি রেজা এবং সমাজকল্যাণ সম্পাদক রঞ্জুকে।

সেলিম চৌধুরী পাকবাহিনীর হাতে ধরা পড়েছিলেন নওগাঁ শহরের উপকণ্ঠে। বডি বিল্ডার মিস্টার নাটোর সেলিম চৌধুরীর জন্যও বুলেট খরচ করেনি পাকবাহিনী। সবরকম শারীরিক অত্যাচার করেছে। তারপর তাঁকে জিপের পেছনে শিকল দিয়ে বেঁধে পুরো নওগাঁ শহর ঘুরেছে তারা। মৃত্যু নিশ্চিত হবার পরে লাশ ফেলে গেছে রাস্তার ধারে।

বাবুলকে নাটোর শহরের কেন্দ্রস্থল থেকে ধরে নিয়ে গিয়েছিল পাকবাহিনী। তাদের ক্যাম্প ছিল এখনকার উত্তরা গণভবনে। ছেলের খোঁজ নিতে সেখানে গিয়েছিলেন প্রৌঢ় পিতা। পিতা-পুত্রকে একসাথে গুলি করে হত্যা করল পাকিস্তান নরপিশাচরা।

সন্তানদের বলি-- যে স্বাধীন দেশের তোমরা নিশ্বাস নিচ্ছো, সেই বাতাসের জন্য তোমরা হাজার হাজার মুক্তিযোদ্ধার কাছে ঋণী। হয়তো দেশটি তোমাদের মনের মতো হয়নি। দেশকে মনের মতো করে গড়ে তোলার মাধ্যমেই তাদের ঋণ তোমাদের শোধ করতে হবে। একাত্তরের মুক্তিযুদ্ধকে কোনোভাবেই খাটো করো না। করলে তোমাদের নাম তালিকাভুক্ত হবে কুলাঙ্গারের খাতায়।

১৯৭৫-এ বাংলাদেশে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবের হত্যাকান্ড : খন্দকার মোশতাক ও সি.আই.এ 'র ভূমিকা

বাকশিমুল

আমেরিকা বাংলাদেশের মুক্তিসংগ্রামের বিরোধীতা করেছিল গণহত্যাকারী পাকিস্তানের পক্ষ নিয়ে, পাকিদের অস্ত্র ও কৌশল দিয়ে সহায়তা করে। মুক্তি সংগ্রাম যখন চূড়ান্ত পর্যায়ে, তখন এই খন্দকার মোশতাক আহমেদের মাধ্যমেই তাঁরা সেই সংগ্রাম বানচাল করতে অগ্রসর হয়েছিল।

এই ষড়যন্ত্রটি ছিল আমেরিকার পূর্ব ও পশ্চিম পাকিস্তান নিয়ে একটি 'কনফেডারেশন' গঠন করে পূর্ব ও পশ্চিম পাকিস্তানের মধ্যে একটা মীমাংসা করে দেবার পরিকল্পনা। আমেরিকার এই ষড়যন্ত্রের কথা জানতে পেরেই খুব সম্ভবত ভারত নিজেই শেষ পর্যন্ত মুজিবনগরে বাংলাদেশ সরকারের পক্ষ হয়ে মুক্তিযুদ্ধে অংশগ্রহণ করে। আমেরিকার নিক্সন প্রশাসন তাতে ক্ষিপ্ত হয়ে বঙ্গোপসাগরে অসীম শক্তিশালী সপ্তম নৌবহর পাঠায়।

মোশতাক ও তার সহচর গোষ্ঠীর (চাষী-তাহের-মওদুদ ও অন্যান্য) সঙ্গে মার্কিন গুপ্তচর সংস্থা, সি.আই.এ-এর গভীর আঁতাত হয়েছিল ১৯৭১ সালের মুক্তি সংগ্রামের সময়ই। মার্কিনী কর্তাদের প্ররোচনায় মোশতাক বাংলাদেশের স্বাধীনতাতেই কুঠারাঘাত করতে গিয়েছিলেন। কিন্তু শেষ পর্যন্ত সে ষড়যন্ত্র ফাঁস হয়ে যাওয়ায় তাঁর মতলব হাসিল হয়নি।

মুজিবনগরের স্বাধীন বাংলাদেশ সরকারের বিদেশমন্ত্রী ছিলেন তখন খন্দকার মোশতাক আহমেদ। দাম্ভিক, হঠকারী ও প্রতিহিংসাপরায়ণ তার চরিত্র। তার ধারণা, রাজনীতির খেলায় বাংলাদেশে তাঁর চেয়ে বড় ওস্তাদ আর কেউ নেই, শুধু ক্লিকবাজি করে একদল লোক প্রধান নেতার চেয়ারটি তাঁর কাছ থেকে কেড়ে নিয়েছে।

মন্ত্রীসভার বিভিন্ন লোকে বলত মোশতাকের হাসিতেও আছে ছুরির ধার। চোখের দৃষ্টি সাপের চেয়েও হিংস্র। বলা বাহুল্য, মুজিবনগরের বাংলাদেশ সরকারের বিদেশমন্ত্রীর দপ্তর পেয়ে, তিনি খুশি ছিলেন না। তাঁর চোখ ছিল সেরা চেয়ারের দিকে; প্রধানমন্ত্রীর আসনে। কিন্তু সে আসনে তখন তাজউদ্দিন আহমেদ বসেছেন আর ভারপ্রাপ্ত প্রেসিডেন্টের আসনটি নজরুল ইসলাম এর কব্জায়। সে জন্যই মোশতাক আহমেদের চিত্তে জ্বালা। আর পাকিস্তানের বড় বন্ধু তখন আমেরিকা। সেই আমেরিকার বড় কর্তারা যখন টের পেলো সরকারে মোশতাক গংয়ের মত চরিত্র রয়েছে তখন পিছন থেকে ছুরি মারার আয়োজন করলেন । তখন অনেকগুলি মার্কিন সাহায্য সংস্থা দেশছাড়া বাঙালিদের সাহায্যের নামে এগিয়ে এসেছে। সংবাদ সংগ্রহের নামে বহু বিদেশী সাংবাদিক রণাঙ্গনের সেক্টরে সেক্টরে ছড়িয়ে গেছেন, যারা পরবর্তীতে মুজিবকে ভিলেন সাজাতেই ব্যস্ত হয়ে গিয়েছিল!

তখন দেখা যেত মুজিব নগরের বাংলাদেশ সরকারের বিদেশদপ্তরের সঙ্গে মার্কিনী কর্তাদের বড় দোস্তালি। ঐ দপ্তরের মনোনীত ব্যক্তির তৈরি করা তালিকায় যাদের নাম থাকবে, সাহায্য দেওয়া হবে শুধু তাদের সাথেই এসব কর্তাদের বৈঠক হত।

এ সময়ে ফয়েজ আহমেদ ছিলেন ঢাকার এক বিশিষ্ট সাংবাদিক। সে 'মুজিব হত্যার তদন্ত' (যা মুজিব কিলিং নিয়ে প্রকাশিত সর্বপ্রথম বই) এর লেখক পরেশ সাহাকে বলেছিলেন, 'আমেরিকানরা টাকা দিচ্ছে, অনেকে নিচ্ছেন। আমি কিন্তু সাফ কথা বলে এলাম, ও টাকা আমি নেবো না। কারণ ও টাকা দিয়ে আমেরিকা আমাদের মনুষ্যত্ব কিনতে চায়'।

যদিও ফয়েজ আহমেদ টাকা নেননি, কিন্তু তা অনেকে নিয়েছিল!

কলকাতার বাংলাদেশ মিশনে ছিল মোস্তাক আহমদের সরকারি দপ্তর। ভারতে বাংলাদেশের ডেপুটি হাইকমিশনার হোসেন আলী স্বাধীন বাংলাদেশ সরকারের প্রতি আনুগত্য প্রকাশ করেছিলেন এক

বিশেষ কারণেই। এই হোসেন আলী'র পাল্টি খাওয়ার মূলে ছিল পাকিস্তান সরকার তাঁকে রাওয়ালপিন্ডিতে বদলির আদেশ দিয়েছিলেন, কিন্তু সেখানে যেতে তাঁর মন সায় দিলো না আর তাই তিনি তাজউদ্দিন সাহেবের কাছে দূত পাঠালেন, স্বাধীন বাংলাদেশ সরকার যদি বিদেশী মুদ্রায় তাঁদের মাহিনা দিতে রাজি হন, তা হলে তারা পাকিস্তানের দিক থেকে মুখ ফেরাতে পারেন। তাজউদ্দিন রাজি; তাঁর কাছ থেকে আশ্বাস পেয়ে হোসেন আলী সাহেবও কলকাতার বাংলাদেশ মিশনে স্বাধীন বাংলাদেশ সরকারের জাতীয় পতাকা উড়িয়ে দিলেন।

এই দপ্তরের আড়ালে ছিল আরও একটি মন্ত্রণা ঘর, যেখানে মোশতাক আহমদ সর্বেসর্বা। কিছুদিনের মধ্যেই হোসেন আলী ও সেই ঘরের খাতায় নাম লেখালেন। সেখানে আসত আরও অনেকে; কর্ণেল ওসমানি, ব্রাহ্মণবাড়িয়ার তাহেরউদ্দিন ঠাকুর, স্বনির্ভর আন্দোলনের মাহবুবুল আলম চাষী, ফরিদপুরের ওবায়েদুর রহমান. মুন্সীগঞ্জের শাহ মোয়াজ্জেম, চট্টগ্রামের মুজিব বিরোধী পত্রিকা দৈনিক আজাদীর সম্পাদক মোহম্মদ খালেদ। মোট কথা ধীরে ধীরে মোস্তাকের ঐ মন্ত্রণাঘর বাংলাদেশের স্বাধীনতা-বিরোধী চক্রের আড্ডাখানা ও ডলারের মেলায় পরিণত হয়েছিল।

বিশিষ্ট মার্কিন সাংবাদিব লরেন্স লিফশ্যুলজ এর বই 'দ্য আনফিনিশড রেভোল্যুশন'-এ তিনি উল্লেখ করেছেন ১৯৭১ সালে কলকাতায় মোশতাক আহমদের মার্কিন কর্মকর্তাদের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক ছিল, যা তাকে তৎকালীন তাজউদ্দীন আহমদের নেতৃত্বাধীন অস্থায়ী সরকারের সহযোগিতায় গৃহবন্দি করে রাখার সিদ্ধান্তে নিয়ে যায়। তিনি বলেছেন, মোশতাক ছিলেন হেনরি কিসিঞ্জার-এর ষড়যন্ত্রের এক মধ্যস্থতাকারী, যার লক্ষ্য ছিল আওয়ামী লীগের একাংশকে বিচ্ছিন্ন করে পাকিস্তানি সেনাবাহিনীর সঙ্গে স্বাধীনতার চেয়ে কম কিছুতে মীমাংসায় আসা ও পরবর্তীতে দেশ স্বাধীন যদি হয় ও তখন ইসলামিক রিপাবলিক ঘোষণা করার চাপ প্রয়োগ।

মোশতাকের সাথে তাজউদ্দীনের অস্থায়ী সরকারের যুদ্ধ চলাকালীন এই বিরোধের তথ্য লিফশ্যুলজ জেনেছিল মোশতাকেরই এক ঘনিষ্ঠ সহকারীর কাছ থেকে, যিনি ঐ ষড়যন্ত্রে একমত ছিলেন না বলে সে উল্লেখ করেছে এবং তা আরও নিশ্চিত হয় তার আমেরিকান কনসাল জেনারেল হার্ব গর্ডনের সাথে সাক্ষাৎকারের পর।

১৯৭৫ সালের অভ্যুত্থানকালীন সময়ে ঢাকায় নিযুক্ত মার্কিন রাষ্ট্রদূত ইউজিন বোস্টারের সঙ্গে যোগাযোগ করার পর লরেন্স লিফশ্যুলজ কে সে জানায় কিছু ভয়ঙ্কর তথ্য (তার এ স্বীকারোক্তি ছিল বেশ আচমকা ও আনএক্সপেক্টেড)। এ সাক্ষাতকারের সম্পর্কে লিফশ্যুলজ- এর এক রিপোর্টে সে লিখেছিল, 'একজন শীর্ষস্থানীয় মার্কিন দূতাবাস কর্মকর্তা (বোস্টার), যিনি গোপনীয়তার শর্তে সাক্ষাৎ দিয়েছেন, জানিয়েছেন যে ১৯৭৪ সালের শেষ দিকে মুজিব সরকারকে উৎখাত করতে ইচ্ছুক কিছু ব্যক্তি দূতাবাসের কর্মকর্তাদের সঙ্গে একাধিক বৈঠকে মিলিত হয়েছিলেন। এই বৈঠকগুলো হয়েছিল ১৯৭৪ সালের নভেম্বর থেকে ১৯৭৫ সালের জানুয়ারি মাস পর্যন্ত।'

এই বিস্ময়কর বক্তব্যের উৎস ছিলেন মার্কিন রাষ্ট্রদূত ইউজিন ডেভিস বোস্টার। তিনি স্পষ্ট করে বলেন, ওই ব্যক্তিরা ছিলেন মোশতাক গোষ্ঠীর লোকজন। জানুয়ারি ১৯৭৫-এ তিনি দূতাবাসের সকল কর্মীদের (সিআইএ স্টেশন চিফ ফিলিপ চেরি সহ) নির্দেশ দিয়েছিলেন, যেন তারা ওই গোষ্ঠীর সঙ্গে আর কোনো যোগাযোগ না রাখেন। তবে বোস্টার বিশ্বাস করতেন, তার নির্দেশনা উপেক্ষা করে তএন্ড রানদ (লুকিয়ে কার্যক্রম চালানো) হতে পারে। কারণ, যাদের সঙ্গে যোগাযোগ বন্ধের নির্দেশ দেওয়া হয়েছিল, তারাই অভ্যুত্থানের দিন হত্যা ও রক্তপাতের মধ্যে ক্ষমতা দখলের ঘোষণা দিয়েছিল।

লিফশ্যুলজ লিখেছে, ক্ষ্মআমরা জানতে চাইলাম, সিআইএ স্টেশন চিফ চেরি কি দূতাবাসকে না জানিয়ে যোগাযোগ রেখেছিলেন? উত্তরে বোস্টার বললেন, ততাত্ত্বিকভাবে বললে, এ ধরনের কাজ স্টেশন চিফ করে না। কিন্তু একজন আমেরিকান হিসেবে বলছি, অনেক সময় হয়েছে। এই ধরনের ব্যত্যয় ঘটেছেক্ষ্ম। স্টেশন চিফ ফিলিপ চেরীর সাথে ১৫ আগস্টের এক সপ্তাহ আগে ডেপুটি আর্মি চিফ জিয়াউর রহমানের সাথে গুলশানের এক ব্যাবসায়ীর বাসায় একান্ত বৈঠক হয়েছিল তবেই কি তাদের ষড়যন্ত্র বাস্তবায়নের জন্য? যাইহোক, লিফশ্যুলজের ভাষ্যমতে এটি ছিল এক অভূতপূর্ব মুহূর্ত। একজন মার্কিন রাষ্ট্রদূত নিজেই সাংবাদিকদের বলছেন যে তার অধীনস্থ সিআইএ চিফ হয়তো তার নির্দেশ অমান্য করে অভ্যুত্থানে জড়িতদের সহায়তা করেছে।

যুদ্ধের সময় দেখা যেত মোশতাক মন্ত্রীসভার অধিবেশনে উপস্থিত থাকছে না। তিনি কলকাতার বাংলাদেশ মিশনে বসে বিকল্প মন্ত্রিসভার মতো কিছু একটা গঠন করেছেন। সেই চক্রের চক্রীদের নিয়েই তিনি বৈঠক করেন, আলাপ-আলোচনা করেন।

মোশতাক ক্ষমতায় এলে মাহবুব আলম চাষীকে তাঁর সচিব করে নিয়েছিল। মোশতাক এই মাহবুব আলমের মাধ্যমেই নাকি পাকিস্তানের তৎকালীন স্বৈরাচারী প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়া খানের সঙ্গে যোগাযোগ করার চেষ্টা করেছিল আর মধ্যম সেই আমেরিকা । কথা ছিল, রাষ্ট্রসংঘে বাংলাদেশের বক্তব্য রাখার জন্য স্বাধীন বাংলাদেশ সরকারের বিদেশ-মন্ত্রী খোন্দকার মোস্তাক আহমদ ও বিদেশ-সচিব মাহবুব আলম চাষী নিউইয়র্ক যাবেন। আসলে, এটা ছিল মোস্তাক সাহেবের বাইরের কথা। আসল কথা ছিল অন্য রকম! তা হলো, মোশতাক ও মাহবুব আলম চাষী নিউইয়র্ক যেয়ে পাকিস্তানের প্রতিনিধির সঙ্গে সাক্ষাৎ করবেন। পাকিস্তানের কাছে তাঁদের দাবি পশ্চিম ও পূর্ব পাকিস্তান নিয়ে একটি কনফেডারেশন গঠন। ফলে তৎকালীন পূর্ব পাকিস্তানি মূল পাকিস্তান থেকে বিচ্ছিন্ন হবে না, অথচ পূর্ব পাকিস্তান কিছুটা স্বায়ত্তশাসন ভোগ করবে।

দেশদ্রোহিতার অভিযোগে স্বাধীন বাংলাদেশ সরকার মোশতাককে মৃত্যুদণ্ড দিয়েছিলেন। কিন্তু শেষ পর্যন্ত প্রধানমন্ত্রী তাজউদ্দিনের সুপারিশে ভারপ্রাপ্ত প্রেসিডেন্ট সৈয়দ নজরুল ইসলাম তাঁর প্রতি মার্জনা প্রদর্শন করেন।

কনফেডারেশনে যেই মার্কিনী কর্তাদের থেকে মোশতাক ফান্ড ও কৌশলী সহযোগিতা নিচ্ছিল তাদের মধ্যে একজন ছিল আগস্ট ডেভিড বস্টার; যেঁ ছিল কিসিঞ্জার ও ১৯৭৪ পরবর্তী বাংলাদেশে সিআইএ স্টেশন চিফ ফিলিপ চেরীর ঘনিষ্টভাজন। এই ফিলিপ চেরীর সাথে মুজিব হত্যার আগে জিয়ার ও বৈঠক হয়!

তথ্যসূত্র -

১) লরেন্স লিফশুলজ, The Unfinished Revolution : The muder of Sheikh Mujibar Rahman Zed Books, London, 1979 এখানে উল্লেখ আছে ১৯৭১ সালে কলকাতায় মোশতাক আহমদের মার্কিন কর্মকর্তাদের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক ও তার ষড়যন্ত্রের বিবরণ। একই বইতে মার্কিন রাষ্ট্রদূত ইউজিন বোস্টারের স্বীকারোক্তি ও সিআইএ-এর সম্ভাব্য ভূমিকার উল্লেখ পাওয়া যায়।

২) পরেশ সাহা (সম্পা.), মুজিব হত্যার তদন্ত (বাংলা), প্রথম প্রকাশ ১৯৮০-এর দশক। এখানে সাংবাদিক ফয়েজ আহমেদের বক্তব্য উদ্ধৃত হয়েছে;'আমেরিকানরা টাকা দিচ্ছে, অনেকে নিচ্ছেনখ কিন্তু আমি নেবো না।'

৩. সেলিনা হোসেন ও আনোয়ার পাশা, বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধ দলিলপত্র থেকে নির্বাচন (বহু খণ্ড), বাংলা একাডেমি। খন্দকার মোশতাক আহমদের ষড়যন্ত্র, বিকল্প মন্ত্রিসভার চেষ্টা এবং বিদেশি সংস্থার অর্থায়নের তথ্য।

৪. Anthony Mascarenhas– The Rape of Bangladesh (১৯৭১). পাকিস্তানি সেনাদের নৃশংসতা এবং মার্কিন ভূমিকায় পরোক্ষ সমর্থনের বিশ্লেষণ।

৫. Gary J. Bass– The Blood Telegram Nixon– Kissinger– and a Forgotten Genocide– Knopf– ২০১৩. নিক্সন-কিসিঞ্জারের পাকিস্তান প্রীতি, সপ্তম নৌবহর প্রেরণ ও বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধ বানচাল করার মার্কিন নীতির দলিলভিত্তিক বিশ্লেষণ।

৬. ইউজিন ডেভিস বোস্টার (সাক্ষাৎকার), উদ্ধৃত লরেন্স লিফশ্যুলজ , The Unfinished Revolution. ১৯৭৪-৭৫ সালে মোশতাক গোষ্ঠীর সঙ্গে মার্কিন দূতাবাসের বৈঠক ও সিআইএ চিফ ফিলিপ চেরীর যোগাযোগের ইঙ্গিত।

৭. Syed Badrul Ahsan– From Rebel to Founding Father Sheikh Mujibur Rahman– University Press Limited SUPLV– Dhaka– ২০১০. মোশতাকের চরিত্র, উচ্চাভিলাষ ও মুক্তিযুদ্ধকালীন ভূমিকার বিশ্লেষণ।

৮. সেলিনা হোসেন, তাজউদ্দিন আহমেদ নেতা ও পিতা (Dhaka, ১৯৯৭). তাজউদ্দীন আহমদের দৃষ্টিকোণ থেকে মোশতাকের ষড়যন্ত্র, বিকল্প মন্ত্রিসভার চেষ্টা ও মুজিবনগর সরকারের অভ্যন্তরীণ দ্বন্দ্ব।

স্মরণ

আনন্দ ঘোষ হাজরা

ভাষা সংসদের প্রতিবেদন

ষাটের দশকের কবি , অনুবাদক , প্রাবন্ধিক আনন্দ ঘোষ হাজরা চলে গেলেন। দীর্ঘদিন ধরে শারীরিক অসুস্থতা ও বয়সজনিত সমস্যায় ভুগছিলেন তিনি।

ষাটের দশকের সমসাময়িক কবিদের থেকে তাঁর কণ্ঠস্বর আলাদা ছিল। প্রথম কাব্যগ্রন্থ ''দ্রুত ধাবমান স্বয়ংস্বরে''। সেই নিজস্ব এক স্বর তাঁর কবিতায় আমরা বারবার দেখেছি।

''যখন মন্দির মসজিদে গীর্জায়
যাজক পুরোহিত ও মৌলবীরা
ঘুম ভেঙ্গে দেখতে পেলেন
ধ্বনিহীন ভূমিকম্পে
তাঁদের নীচের মাটি
দুলে উঠছে ফাটল ধরছে ,
এই সেই মুহূর্ত
যখন গ্যালিলিও গ্যালিলেই
দূরবীণে চোখ রেখে
দূরবীণের মুখটা
চাঁদের দিকে ঘুরিয়ে দিলেন।''

তিনি দীর্ঘদিন ধরে অদম্য নিষ্ঠায় পৃথিবীর অন্য ভাষা থেকে অনন্য কবিদের মহার্ঘ কবিতা মঞ্জরী বাংলা ভাষার অঙ্গনে রোপণ করেছেন। আমরা তাই পেয়েছি মিরোস্লাভ হলুবের কবিতা, মারিন সোরেস্কুর কবিতা, স্টুয়ার্ট ফ্রিবার্টের কবিতা, জুডিথ হারজবার্গের কবিতা।

অনুবাদ পত্রিকায় তিনি নিরবচ্ছিন্ন ও নিরলসভাবে সাহিত্য সাধনা করেছেন। আমরা সমৃদ্ধ হয়েছি।

ভাষা সংসদ থেকে প্রকাশিত হয়েছে তাঁর গ্রন্থ ''উদ্ধত যত শাখার শিখরে''

অনুবাদ পত্রিকা এই সারস্বত সাধককে 'অনুবাদ পত্রিকা জীবনকৃতি সম্মানষ , এ ভূষিত করেছিল ২৫ মার্চ, ২০২৪ এ।সেদিন শারীরিক অসুস্থতার কারণে তিনি আসতে পারেননি।

পরে তাঁর বাড়িতে গিয়ে সম্মাননা তুলে দেওয়া হয়েছিল।

তাঁর প্রয়াণে আমরা হারালাম আমাদের পরিবারের এক গুরুত্বপূর্ণ শ্রদ্ধেয় সদস্যকে।

আমরা মর্মাহত ও গভীর শোক প্রকাশ করি।

তাঁকে জানাই আমাদের সশ্রদ্ধ প্রণাম।

আসাম খবরের নীচে চাপা পড়ে যাচ্ছে আসল খবর।

মনিরুল হক

ধর্ম পরিচয়ে মুসলমান, এরকম কিছু মানুষ ও মানুষী; দেশের সরকার বিরোধী মুখ রাহুল গান্ধী এবং বিশিষ্ট কিছু সাংবাদিক-আপাত সম্পর্কহীন এইসব ব্যক্তি ও গোষ্ঠী বারবার বাঁধা পড়ছেন চরম কতৃত্ববাদী, হিংস্র এক রাষ্ট্রশক্তির জালে যার শেষতম উদাহরণ জনপ্রিয় সাংবাদিক, ইউটিউবার শ্রী অভিসার শর্মা। এর আগে মিডিয়া হাউস দখল করা, মালিকদের মাধ্যমে সাংবাদিকদের চাকরিচ্যুত করা, তাঁদের পদত্যাগে বাধ্য করা প্রভৃতি অনেক ঘটনাই ঘটেছে দেশজুড়ে। এই মুহূর্তে দেশের প্রধান সব (দু'একটি বাদে) সংবাদপত্র এবং টেলিভিশন চ্যানেল বিজেপি দল ও কেন্দ্রীয় সরকারের নিশর্ত আনুগত্য স্বীকার করেছে। বিরোধী রাজনৈতিক দলসমূহ এবং সাধারণ মানুষের কথা বলার জন্য যাঁরা নিরলস পরিশ্রম করে যাচ্ছেন তাঁদের মধ্যে অতি বিখ্যাত দুজন সিদ্ধার্থ বরদারাজন ও করণ থাপারকে জেলে ঢোকানোর তোড়জোড় চলছে। তাঁদের বিরুদ্ধে অভিযোগ, কিছুদিন আগে ঘটে যাওয়া পাক-ভারত যুদ্ধে যুদ্ধবিমান খোয়া যাওয়ার জন্য তাঁরা রাজনৈতিক নেতৃত্বকেই দায়ী করেছেন। এটা নাকি একটা সাংঘাতিক অপরাধ আর তার জন্য তাঁদের নামে অভিযোগ জমা পড়েছে সুদূর আসামের এক থানায়। সুপ্রিম কোর্টের অন্তর্বর্তী আদেশে অবশ্য তাঁরা এখনও জেলের বাইরে।

নতুন আসামী অভিসার শর্মা। তাঁরও বিরুদ্ধে অভিযোগ জমা পড়েছে।এবং জমা পড়েছে সেই আসামেই। তাঁর বিরুদ্ধে অভিযোগ, তিনি বলেছেন যে বিজেপি সরকার শুধুমাত্র হিন্দু-মুসলিম মেরুকরণের উপর টিকে আছে। তিনি বিজেপির তথাকথিত 'রামরাজ্য' স্থাপনের অসারতার কথাও উল্লেখ করেছেন। অতএব, তিনি অপরাধী। অভিযোগকারী অলোক বড়ুয়ার মতে তিনি আসাম সরকার ও কেন্দ্রীয় সরকারকে উপহাস করেছেন এবং সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি ক্ষুন্ন করায় উৎসাহ দিচ্ছেন। অভিসার শর্মাও আপাতত অন্তবর্তীকালীন জামিন পেয়েছেন সুপ্রিম কোর্ট থেকে। কিন্তু সুপ্রিম কোর্ট এও বলেছে, এফ আই আর রদ করার জন্য তাঁকে আসাম হাইকোর্টে হাজিরা দিতেই হবে।

মনে হতেই পারে, জলের মত সত্য এইসব কথা বলার জন্য অভিসার শর্মার বিরুদ্ধে কোন মামলা দায়ের হতেই পারে না। কিন্তু তাও তো হয়েছে। উদ্দেশ্য শ্রী শর্মাকে জেলের ঘানি টানানো। কারণ তাঁর ইউটিউব চ্যানেলের সাবস্ক্রাইবারের সংখ্যা ৯০ লক্ষ এবং তাঁর ভিউয়ারের সংখ্যা ৩.১ কোটি ! সব দুর্নীতি, অপকর্মের কথা বিশ্ববাসী জেনে যাচ্ছে আর ছ্যা-ছ্যা করছে। এসব কি মেনে নেওয়া যায় !

এতক্ষণ যা বললাম তা হচ্ছে খবরের একটি পর্ব। আসলে এই খবর আর এই হেনস্থার পিছনে আছে আরও বড় একটা খবর। তা হল জল-জঙ্গল-জমি-পরিবেশ ধ্ববংস করে, বন্যপ্রাণ আর মানুষকে শেষ করে দিয়ে মুনাফাখোর দু'এক জন মানুষকে অবাধ শোষনের সুযোগ করে দেওয়ার এক পরিকল্পনা। আর সেই কথা যাতে পাঁচকান না হয় তা দেখার জন্য জাল বিস্তার করা, সব মুখ বন্ধ করা।

আসামের দ্বিতীয় বৃহত্তম জেলা হল ডিমা হাসাও। এখানকার মানুষজনের মধ্যে প্রায় ৭১ শতাংশ হলেন ট্রাইবাল। ভারত সরকারের আইন অনুযায়ী ১৯৫১ সালেই তাঁরা ষষ্ঠ অফশিলের অন্তর্ভুক্ত। আমরা জানি এই ষষ্ঠ তফশিল আদিবাসী /জনজাতি/উপজাতিভুক্ত মানুষদের জীবন, জীবিকা, অভ্যাস, প্রথা, ধর্ম, কৃষ্টি, সংস্কৃতি রক্ষায় এক গুরুত্বপূর্ণ হাতিয়ার। দেশের সংবিধানের এই ষষ্ঠ তফশিল অনুযায়ী আসাম, মেঘালয়, মিজোরাম ও ত্রিপুরার উপজাতি অধ্যুষিত এলাকার স্বায়ত্বশাসনের জন্য জেলা ও আঞ্চলিক কাউন্সিল গঠন করে তার মাধ্যমেই প্রশাসন চালানো এমনকি বিচারিক প্রক্রিয়া সম্পন্ন করার কথা বলা হয়েছে। এলাকার উন্নয়ন যে কোন কর্মকান্ডে মানুষের প্রত্যক্ষ অংশগ্রহণ ও সিদ্ধান্ত গ্রহণের সুস্পষ্ট নিদান রয়েছে।

কিন্তু এই ষষ্ঠ তফসিলকে বুড়ো আঙুল দেখিয়ে ডিমা হাসাও জেলার উমরঙসো এলাকায় ৩০০০ বিঘা জমি থেকে মানুষকে উচ্ছেদ করে, পরিবেশ ধ্বংস করে সেখানে এক সিমেন্ট কারখানা গড়ে তোলার পরিকল্পনা গ্রহণ করা হয়েছে। এলাকার মানুষ এই পরিকল্পনা প্রত্যাখ্যান করেছেন, প্রতিরোধের শপথ গ্রহণ করেছেন। ২০২৪ সালের প্রথমদিকে এলাকার মানুষ বুঝতে পারেন কিছু একটা হতে চলেছে। ওই বছরের এপ্রিল-মে মাসে পাটোয়ারীর মাধ্যমে প্রস্তাব দেওয়া হয় বিকল্প বসতিতে চলে যাওয়ার জন্য এবং সেখানে বাড়িঘর তৈরির জন্য ২ লক্ষ টাকা করে দেওয়ার কথাও বলা হয়। এলাকার মানুষ এই প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করেন এবং তাঁদের পক্ষে একটি জনস্বার্থ মামলাও দায়ের করা হয়। এরপর ওই বছরেই একটি সিমেন্ট কারখানা তৈরির জন্য অক্টোবর মাসে ২০০০ বিঘা এবং পরের মাসে আরও ১০০০ বিঘা জমি তুলে দেওয়া হয় 'মহাবল সিমেন্ট প্রাইভেট লিমিটেড' নামক এক কোম্পানির হাতে। এর পরেই NOBDI LONGKU KRO এবং CHOTOTARPHENG,এই দুটি গ্রামের ২২ জন মানুষ আদালতে অভিযোগ পেশ করে তাঁদের বসতিতে সিমেন্ট কারখানা গড়ার বিরোধিতা করেন। তাঁরা বলেন, সেখানে তাঁরা ১৯৭৫ সাল থেকে বসবাস করছেন এবং তাঁরা স্থানীয় প্রশাসনকে ট্যাক্স-ও প্রদান করেন। এটা তাঁদের স্থায়ী বসতি এবং তাঁরা এই এলাকা কোন অবস্থাতেই ছাড়বেন না। তাঁরা জন আন্দোলনের পাশাপাশি আদালতের-ও শরণাপন্ন হন।

এই বছরের ফেব্রুয়ারি মাসে প্রথম হিয়ারিং হয় এবং এ পর্যন্ত মোট ৯টি হিয়ারিং হয়েছে। শোরগোল পড়েছে আগস্ট মাসের সর্বশেষ হিয়ারিং-এ বিচারক সঞ্জয় কুমার মেধির মন্তব্যে। তিনি বলেন- ৩০০০ বিঘা! কি হচ্ছে? ৩০০০ বিঘা জমি একটি প্রাইভেট কোম্পানিকে দেওয়া হচ্ছে? এটা কি ধরনের সিদ্ধান্ত? এটা কি এক

ধরনের রসিকতা না অন্য কিছু? মহামান্য বিচারপতির এই পর্যবেক্ষণ ও মন্তব্য ছড়িয়ে পড়েছে সারা দেশে।

যে জায়গায় এই সিমেন্ঠ কারখানা গড়ার কথা হয়েছে সেই উমরঙসো একটি সমৃদ্ধ প্রাকৃতিক এলাকা। এখানে আছে উষ্ণ প্রস্রবন। আছে পরিযায়ী পাখির আশ্রয়স্থল। বন্যজন্তুও আছে অনেক। এটি একটি মাছ শিকার ক্ষেত্র। আছে বিশাল উমরাংসো লেক এবং কুপলি নদী। প্রকৃতি প্রেমীদের কাছেও উমরঙসোর কদর খুব বেশি। জঙ্গল ভ্রমণ এবং ট্রেকিং রুটের জন্যও উমরঙসো বিখ্যাত। এখানকার মানুষজনও যথেষ্ট সচেতন। যেখানে ভারতের শিক্ষিতের হার গড়ে ৬০ এর মত সেখানে এখানকার গড় ৭৪%। তাই নতুন করে আবার একটি সিমেন্ট কারখানা গড়ার বিরুদ্ধে মানুষ লড়াইয়ের শপথ নিয়েছেন। সরকার চায় না, আন্দোলন জমাট বাঁধুক, এইভাবে আদিবাসী মানুষদের উচ্ছেদ ও প্রকৃতি ধ্বংসের কথা সারা দেশের মানুষ জানুক। তারা অপকর্ম ঢাকতে তৎপর। সেই কারণেই অভিসার শর্মার বিরুদ্ধে মামলা দায়ের করা হয়েছে। উদ্দেশ্য তাঁকে জেলে ভরে রাখা এবং আন্দোলনরত মানুষের মনে ভীতির সঞ্চার করা। কিন্তু সরকার তথা শাসকদল বিজেপি একথা বুঝতে পারছে না যে মানুষ ভয়-ভীতি কাটিয়ে উঠেছে। শুধু ডিমা হাসাও নয়, শুধু আসাম নয়, সারা দেশ জুড়েই বইছে এক নতুন হাওয়া।

এদিকে প্রবীণ সাংবাদিক The Wire এর সম্পাদক সিদ্ধার্থ বরদারাজন ও করণ থাপারের নামে আসাম পুলিশের চজ্জট্ট দায়ের করার প্রতিবাদে বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের পক্ষ থেকে জয়রাম রমেশ, দিগবিজয় সিং, মুকুল ওআসনিক, রেনুকা চৌধুরী , শক্তি সিনহা গোহিল , সৈয়দ নাসির হুসেন, জন বৃত্তাস , তিরুচি শিবা প্রমুখ সাংসদ বিবৃতি দিয়েছেন জ্জ এদিকে The Wire এর পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে বেশ কয়েকদিন অন লাইন ও গুয়াহাটিতে চেষ্টার পর তারা আসাম পুলিশের করা FIR এর কপি পেয়েছেন। যার NO ৩/২০২৫ PS Crime Branch গুয়াহাটি Dt. Mai ৯, ২০২৫.

দেশের গণতন্ত্র হত্যার উদ্দেশ্যে বিজেপি সরকারের নয়া বিল

অমিতাভ সিংহ

ভারতবর্ষ কি দিন দিন পুলিশ রাষ্ট্রের দিকে এগিয়ে চলেছে? এই প্রশ্নটি আজ আর অলীক বলে মনে হচ্ছে না। গত ২০ আগস্ট কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ যিনি ফৌজদারি অপরাধে অভিযুক্ত হয়ে জেল খেটেছিলেন, তিনি সংসদে তিনটি নতুন বিল আনলেন যাতে বলা হয়েছে যদি প্রধানমন্ত্রী, কেন্দ্রীয়মন্ত্রী,মুখ্যমন্ত্রী বা রাজ্যের কোন মন্ত্রী কোন অপরাধে তিরিশ দিন জেল হেফাজতে থাকেন তাহলে ৩১ দিনের দিন তাকে পদ থেকে সরিয়ে দেওয়া হবে। অর্থাৎ অপরাধ প্রমাণের আগেই তাকে শাস্তি পেতে হবে। এর মানে একটাই বিচারপতিরা তার বিচার করবেন না, প্রশাসন সেই দায়িত্ব নেবে। বকলমে যে দল কেন্দ্রে ক্ষমতায় থাকবে তাদের হাতেই থাকবে নির্বাচিত সরকার নড়বড়ে করে ইচ্ছামত তা ভেঙে দিয়ে নিজেরা ক্ষমতায় আসার। এতদিন অর্থ ও অন্যান্য ক্ষমতা প্রয়োগ করে অরুণাচল, মণিপুর,মধ্যপ্রদেশ, মহারাষ্ট্র ইত্যাদি রাজ্যে নির্বাচিত সরকার ফেলে বিজেপি ক্ষমতায় এসেছিল।এখন বোধহয় সেই আত্মবিশ্বাসে চিড় ধরেছে। তাই আজ সংবিধান পরিবর্তন করে এই ফ্যাসিস্ট পথ নিতে হচ্ছে।

আর সিবিআই, ইডি , ইনকাম ট্যাক্স কার ঘাড়ে কটা মাথা আছে যে দুর্নীতির অভিযোগে দেশের প্রধানমন্ত্রীকে জেলে নিয়ে যাবে ? লোককে এরা কতটা বোকা ভাবে ? এর আগে শুধুমাত্র অভিযুক্ত হিসাবে বিচারাধীন বন্দী থাকার সময় যে কোন মন্ত্রীকে সরিয়ে দেওয়ার সংস্থান সংবিধানে ছিল না। যদিও এটা ঠিক যে এই মূহুর্তে সরকারের হাতে সংসদে দুই তৃতীয়াংশ সংখ্যাগরিষ্ঠতা নেই। তাছাড়া এই ১৩০ তম সংবিধান সংশোধনী বিল সুপ্রীম কোর্টে চ্যালেন্জ হলে তা সংবিধান বিরুদ্ধ বলে খারিজ হয়ে যাবে বলেই সংবিধান বিশেষজ্ঞদের অভিমত।কারণ এটি সংবিধানের মূল কাঠামোর বিরুদ্ধে। কেশবানন্দ ভারতী মামলায় সুপ্রীম কোর্টের ১৩ জন বিচারপতির বেঞ্চ রায় দিয়েছিল সংবিধানের মূল কাঠামো বদলানো যাবে না। তাসত্ত্বেও বিজেপি এই বিল পেশ করল কেন? শুধু কি দৈনন্দিন সমস্যাগুলি সমাধান করতে ব্যর্থ হওয়ায় ও বিভেদমূলক রাজনীতি কিছুটা দূর্বল হয়ে যাওয়ায় বিজেপিকে ক্ষমতায় থাকতে প্রতিদিন নিত্যনতুন কৌশল তৈরী করতে হচ্ছে? নাকি সারা দেশে একটা ভয়ের পরিবেশ তৈরী ও বিরোধী আঞ্চলিক দলগুলিকে চাপে রেখে নিজেদের দিকে সমর্থন আদায় করার একটা পরিকল্পনা চাষ করতে চাইছে তারা।সবাই জানে কেন্দ্রীয় সরকার ইচ্ছে করলে সিবিআই , ইডি , আয়কর বিভাগ প্রভৃতিকে খাঁচার তোতা করে রাখতে পারে যেমন আজ রেখেছে। তাদের বিরোধী নেতা মন্ত্রীদের পিছনে লাগিয়ে বিড়ম্বনায় ফেলতে পারে। বস্তুত সিবিআই, ইডি আজ আর তদন্তকারী সংস্থা নেই। বিরোধী নেতাদের হয়রান করার যন্ত্র হয়ে উঠেছে মাত্র। মানহানি মামলায় রাহুল গান্ধীকে সর্বোচ্চ সাজা দিয়ে তার সাংসদপদ খারিজ করে, বাংলো থেকে অপসারণ করে , গুজরাটের এক বিচারপতি প্রমাণ করে দিয়েছিলেন এই দলে তারাও নাম লিখিয়েছেন।

গত একদশকে যেভাবে মোদী অমিত শাহ জুটি বিরোধী দলের নির্বাচিত সরকার ভাঙার খেলায় নেমেছেন সেই নিরিখে বিষয়টি বিশেষ গুরুত্বের দাবী রাখে। বিলটি পাশ হলে কেন্দ্রীয় সরকারের হাতে বিচার বিভাগীয় পদ্ধতির তোয়াক্কা না করে সরাসরি রাজ্য

সরকারকে সরিয়ে দেওয়ার ক্ষমতা থাকবে। দোষী সাব্যস্ত না করেই,শুধু অভিযোগের ভিত্তিতে। প্রশাসন আদালতের ভূমিকা পালন করবে। এই বিল সংবিধানে প্রদত্ত আইনসভা, প্রশাসন ও বিচারবিভাগের মধ্যে ক্ষমতার পৃথকীকরণের যে মৌলিক ধারণা তার বিরোধী শুধু নয় যুক্তরাষ্ট্রীয় কাঠামোর পরিপন্থী। এই প্রসংগে গোয়া হাইকোর্ট বার এসোশিয়েশনের একটি অনুষ্ঠানে দেশের প্রধান বিচারপতি বি আর গাভাই সম্প্রতি ঘুরিয়ে এই বিলটির সমালোচনা করে বলেন 'প্রশাসনকে বিচারপতির ভূমিকা নিতে দিলে সংবিধানের ওপর আঘাত করা হবে।'

এই বিল পাশ হয়ে আইনে পরিণত হলে দেশে এখনো যেটুকু স্বাধীন বিচারব্যবস্থা বর্তমান তার সলিল সমাধি ঘটবে। কারণ এই বিলের মাধ্যমে নির্বাচিত সরকারে হস্তক্ষেপ করতে চাইছে কেন্দ্রীয় সরকার। সংবিধানের মূল নীতির বিরুদ্ধে গিয়ে প্রধানমন্ত্রী ও স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীকে বিশেষ ক্ষমতাশালী করার চেষ্টা ও গোপন ইচ্ছা রয়েছে এই বিলে। যদিও বিল পেশের দুদিন পর বিহার ও দমদমের জনসভায় মোদী স্পষ্ট করে দিয়েছেন এমন তুঘলকি সিদ্ধান্তের পিছনে রাজনীতি ও পেছনের দরজা দিয়ে বিজেপির ক্ষমতা দখল করাই প্রধান উদ্দেশ্য। তিনি একথাও বলেছেন যে যারা চোর তারা বিরোধীতা করছে। এটা ঠিক যে ২০১৪ সাল থেকে দেশে মোট ২২ জন মন্ত্রী জেলের ভাত খেয়েছেন। মুখ্যমন্ত্রীদের মধ্যে রয়েছে অরবিন্দ কেজরিওয়াল, জয়ললিতা ও হেমন্ত সোরেন। পশ্চিমবঙ্গের পাঁচ মন্ত্রী, পার্থ চট্টোপাধ্যায়, জ্যোতিপ্রিয় মল্লিক, মদন মিত্র, ফিরহাদ হাকিম ও প্রয়াত সুব্রত মুখার্জী। সবাই তৃণমূল কংগ্রেসের। এছাড়া আপ,এআইএডিএমকে, ডিএমকে,এনপিসির মন্ত্রীরা জেল খাটার তালিকায় আছেন।এর মধ্যে বিজেপি শাসিত রাজ্যের কোন নেতা মন্ত্রী নেই। এই সময়ে অন্তত ২৫ জন বিজেপিতে যোগ দিয়েছেন যাদের বিরুদ্ধে দুর্নীতির প্রবল অভিযোগ ছিল। এদের মধ্যে তিনজনের বিরুদ্ধে তদন্ত বন্ধ হয়ে গেছে,২০ জনের বিরুদ্ধে তদন্ত বিশ বাঁও জলে। তাদের বিরুদ্ধে সিবিআই ও ইডি নড়াচড়া করা বন্ধ করে দিয়েছে। এই তালিকায় উল্লেখযোগ্য নাম বর্তমান অসমের মুখ্যমন্ত্রী হেমন্তবিশ্ব শর্মা। সারদা কেলেঙ্কারিতে তার নাম ছিল। এখন সিবিআই তার নামে তদন্ত প্রায় বন্ধ করে দিয়েছে। এরাজ্যের বিধানসভার বিরোধী নেতা শুভেন্দু অধিকারী,যাকে টেলিভিশনে দেখেছি হাত বাড়িয়ে টাকার বান্ডিল ঘুষ হিসাবে নিতে তার বিরুদ্ধে তদন্ত স্তব্ধ হল বিজেপিতে নাম লেখানোর পর।মহারাষ্ট্রের একনাথ সিন্দে,অজিত পাওয়ার(৭০ হাজার কোটি টাকার দুর্নীতিতে অভিযুক্ত) ,অশোক চহ্বন,প্রফুল্ল প্যটেল বিজেপির ছাতার তলায় এসে বিজেপির ক্ষমতায় আসা নিশ্চিত হতেই সব তদন্ত কর্পূরের মত উবে গেল। ২০১৯ সালে একটি চ্যানেলে বলেছিলাম এরা সবাই পদ্ম ছাপ বার সাবানে শরীর ধুয়ে কিভাবে কলঙ্কমুক্ত হলেন তা গবেষনার বিষয়। এখন তো বিজেপির ওয়াশিং মেশিন শধবন্ধটি বহুল প্রচলিত। অপরাধ প্রমাণের আগে মন্ত্রীত্ব চলে যাবে অথচ আইনসভার সদস্য অর্থাৎ বিধায়ক বা সাংসদপদ থাকবে এমন হাস্যকর যুক্তি বোধহয় হবুচন্দ্রের জমানাতেও ঘটা সম্ভব ছিল না।

এটা ঠিক যে রাজনীতি ও প্রশাসন দুর্নীতিমুক্ত করা প্রয়োজন। এর জন্য আইন প্রণয়ন করার প্রয়োজনীয়তা উপেক্ষা করা যায় না। রাজীব গান্ধী দলত্যাগ বিরোধী আইন এনেছিলেন।তাসত্ত্বেও এর ফাঁক দিয়ে এখনো অনেকে গলে যান কারণ প্রশাসনের সদিচ্ছার অভাব।তাই এই বিল আনার আগে সংসদ তো বটেই বৃহত্তর রাজনৈতিক অঙ্গনেও এবিষয়ে বিশদ আলোচনা ও বিতর্কের প্রয়োজন ছিল।কিন্তু এত বেশী ক্ষমতা যে কেন্দ্রীয় শাসকদলের হাতে কুক্ষিগত হওয়া প্রজাতন্ত্র, গণতন্ত্র বা যুক্তরাষ্ট্র কাঠামোর পক্ষে অতীব বিপজ্জনক তা বুঝতে অসুবিধা হয় না।কদিন আগে এরাই কিনা জরুরী অবস্থার সুবর্ণ জয়ন্তী পালন করে লম্বা চওড়া ভাষন দিলেন। তারপরেই নিবিড় ভোটার তালিকা সংশোধন প্রক্রিয়ায় সাধারণ মানুষের অধিকার লঙ্ঘন এবং তার পরপরই নতুন এই বিলটি এনে সাংবিধানিক পদ্ধতিতে নির্বাচিত জনপ্রতিনিধিদের ওপর কেন্দ্রীয় হস্তক্ষেপ, এই জোড়া ফলায় গণতন্ত্র ধ্বংস করার অভিপ্রায় যে দেশের মানুষ রোখার মত ক্ষমতা ধরে এই বিশ্বাস রাখতে হবে।